প্রতিজ্ঞান

শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী।
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীসতীপদ সরকার
১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট কলিকাতা।

মূল্য—দুই টাকা।

'শুভ মহালয়া' ২১শে আশ্বিন, ১৩৪৯ সাল

প্রিণ্টার—বি, এন ঘোষ,
আইডিয়াল প্রেস ১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট কলিকাতা

বাণীর একনিষ্ঠ উপাসক···প্রবীন নাট্যকার ও সুসাহিত্যিক ————

শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

করকমলেষু—

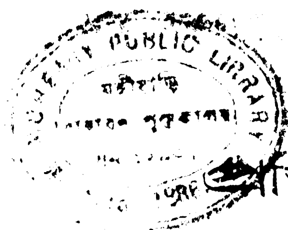
সুধীবর,

সাধনার দীন উপচারখানি বহন কোরে ভীরুচিত্তে যেদিন প্রথম বঙ্গ-বাণীর দেউল প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিন শত সহস্র পূজারিকেই ভারতীর স্বর্ণবেদীমূলে পূজারত দেখেছিলাম; কিন্তু এ নবীন পূজারি কারো এতটুকু কৃপা-কটাক্ষ লাভ করতে সমর্থ হয়নি। সেদিন সুধু পেয়েছিলাম—আপনারই মহান হৃদয়ের অযাচিত সহানুভূতি, অকৃত্রিম স্নেহোপদেশ। আপনিই এ প্রত্যাখ্যাত পূজারির গন্ধহীন পুষ্পদামটী বাণীর চরণ সমীপে নিয়ে যাবার সাহস দিয়েছিলেন; নতুবা এতদিন আমার সকল প্রচেষ্টা, সকল উৎসাহ অঙ্কুরেই হয়ত' বিনষ্ট হ'য়ে যেত।······

আজ তাই আপনার সেই স্নেহ স্মরণ কোরেই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার এ অযোগ্য সাধনাখানি আপনারই হস্তে সমর্পণ কোরে ধন্য হ'লাম।—

"অক্ষয় নিকেতন"
৫২।১, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট।
কলিকাতা।

প্রণত—
শ্রীবিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।



অভিজ্ঞান

...সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ না হ'লেও, একেবারে যে নেই এমন কথাও বলা যায় না। পূর্ব্ব-পুরুষদের ইতিহাসের তালিকাটা বেশ মনোযোগ সহকারে যদি দেখা যায় তাহ'লে হয়ত' কোথাও না কোথাও সম্পর্কের ঈষৎ আভাষ পাওয়া যেতে পারে। তবে ঐ বাহ্যিক সম্পর্কের জেরটা এখানে মোটেই কার্য্যকরী নয়; কারণ যেখানে অন্তরের স্পর্শ বর্ত্তমান সেখানে কোন সম্পর্কই প্রয়োজন হয় না।......

স্নেহের কাঙাল অলক কুমার একদিন অন্তরের স্পর্শ পেয়েই নিজেকে আপন অজ্ঞাতে বিকিয়ে ফেলেছিল—বন্দনার শুভ্র শুদ্ধ হৃদয় খানির মাঝে।

সম্পর্কের বাঁধন তাদের দৃঢ় না হ'লেও, অলক এবং বন্দনা উভয়েই কোনদিন পরস্পরকে পর ভাবেনি বা ভাববার চেষ্টাও করত না। তাদের মতে—বিশেষ কোরে অলকের মতে, সংসারে আপন পর বোলে কিছু নেই। যেখানে প্রাণের আদান প্রদান, সেইখানেই আত্মীয়তা; আর তা' যেখানে নেই সেখানে সুধু যেমন তেমন একটা ভুয়ো সম্পর্কের কোন মূল্যই নেই।

একদিন ঐ মতের উপরই নির্ভর কোরে সে তা'র আত্মীয় স্বজন

সকলের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন কোরে বেরিয়ে পড়েছিল এক অনির্ণীত জীবনের পথে। অবশ্য আত্মীয় স্বজন বল্‌তেও তেমন কেউ তা'র ছিলনা—যা'র মায়া তা'র যাত্রা পথে বাধা দিতে সমর্থ হ'ত।

দুনিয়ায় আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সে হারিয়ে ফেলে পিতাকে। জননীর স্নেহ বক্ষেই তা'র বাল্য জীবন অতিবাহিত হয়। ধনীর ঘরে সে জন্ম লাভ করেনি—পিতা তা'র দরিদ্রই ছিলেন। কাজেই পুত্রের জন্য কিছু সঞ্চয় কোরে যাওয়া তাঁ'র পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমন কি মাথা গুঁজে থাকবার আস্তানাটুকুও তিনি রেখে যেতে পারেননি—তাঁ'র মৃত্যুর সঙ্গে সেটিও বেহাত হ'য়ে যায়।

আত্মীয়ের অপ্রাতুল্য তা'র ছিল না। ধনী নির্ধনী বহু আত্মীয়ই তা'র ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই উদরে তখনও তা'র পিতৃদত্ত অন্ন পরিপাক হয়নি, কিন্তু কেহই সেদিন তাদের পানে অনুকম্পা ভরে ফিরে তাকান্‌নি—যেদিন তা'কে বুকে কোরে তা'র শোক সন্তপ্তা জননী দ্বারে দ্বারে একটু আশ্রয় ভিক্ষা কোরে ফিরেছিলেন।

তারপর স্বার্থ শিখরে উপবিষ্ট হ'য়ে করুণার অভিনয় কোরে যিনি তাদের একটু আশ্রয় দিলেন, তিনি অপর কেউ নন, তা'রই আপন পিতৃব্য। একদিন তা'রই পিতার অন্নে তিনি প্রতিপালিত হ'য়েছিলেন, এবং তাঁ'র উন্নত অবস্থার মূলেও ছিলেন তা'র পিতা।

কতকটা চক্ষু লজ্জা, এবং কতকটা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির মানসে সেদিন তিনি তাঁ'র বিরাট ভবনের মাঝে তাদের একটু আশ্রয় দেন।

অলকের বাল্য জীবন সেইখানেই গড়ে ওঠে। বালক অলক তখন

বুঝত না তা'র অবস্থা, সে জানত না কোথায় আছে! সে ভাবত, সেই সংসারের সেও একজন, সেখানকার প্রত্যেক প্রাণী তা'র পরম আত্মীয়। যদিও গৃহের অপরাপর বালক-বালিকার সঙ্গে পার্থক্য তা'র অনেক ছিল—পোষাক পরিচ্ছদে, আহারাদিতে, খেলাধূলায়, ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয় সকলের সঙ্গেই তা'র অমিল ছিল, এবং পরিশ্রমের মাত্রাও তা'র বড় অল্প ছিলনা,—বাজার করা থেকে আরম্ভ কোরে গৃহের ছোট খাট বহু কর্ম্মই তা'কে করতে হ'ত, তবুও তাতেই তা'র ছিল পূর্ণ আনন্দ। কোনদিন তাদের ব্যবহারে সে এমন সন্দেহ ক'রতে পারেনি যে, তা'রা দু'মুঠো অন্নের বিনিময়ে তা'কে ও তা'র জননীকে দিয়ে সংসারের অনেক কিছুই করিয়ে নেয়।

কিন্তু এ আনন্দ তা'র বেশী দিন স্থায়ী হ'লনা,—একদিন তাদের অন্তরের সত্যতার পরিচয় পেয়ে তা'র ক্ষুদ্র মন বিদ্রোহ ঘোষণা করল।—

বরাবরই তা'র লক্ষ্য ছিল উন্নতির পথে—যেমন কোরে হোক্ লেখা পড়া শিখে তা'কে মানুষ হ'তে হবে—বংশের নাম রাখতে হবে। উদ্যমও ছিল তা'র যথেষ্ট; মেধাও ছিল অসাধারণ। বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে সেও পড়াশুনা করত গ্রামের স্কুলটীতে; তবে শিক্ষা ব্যাপারে সে কোনদিন কারো সাহায্য বা উৎসাহ পায়নি—পাবার প্রয়োজনও তা'র হ'ত না। স্কুলে ভাল ছেলে বোলে তা'র যে খ্যাতি ছিল, তারি জোরে সেথায় কোন খরচ তা'র লাগত না। এমন কি পুস্তকাদিও সে স্কুলের তরফ হ'তেই পেত। গৃহের কোন কিছুই তা'র প্রয়োজন হ'ত না। তবুও কেউই তা'র প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না—ছোট-

বড় আদি কোরে সকলেই কেমন একটা গোপন ঈর্ষা মনে মনে পোষণ করতেন। স্নেহ সে কারো কাছ হ'তেই পেত না। যা' পেত সেটা মৌখিক।

মাঝে মাঝে সে ঐ প্রাণহীন মৌখিক স্নেহের অন্তরালে বিরাজিত প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার ইঙ্গিতও স্পষ্ট অনুভব করত। তবে সেই স্পষ্টতা কোন-দিন তা'র অন্তরে বাসা বাঁধতে পারেনি—বিদ্যুৎ শিখার মত ক্ষণিক উদয় হ'য়ে আবার তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যেত।

কিন্তু স্বার্থের রজ্জু দিয়ে চিরদিন কাউকে বেঁধে রাখা যায় না—টান পড়লেই সে বাঁধন কেটে যাবেই। আচম্বিতে অলকও একদিন সেই রজ্জুতে টান দিলে, যার ফলে তা'র জল ভরা মূক দৃষ্টির সম্মুখে ভেঙ্গে পড়ে গেল তা'র পিতৃব্যের ছলনার প্রাচীর যুক্ত মমতার গৃহ।—প্রকাশ হ'য়ে পড়ল সেখানকার গোপন মনের সত্য কথা।—

তখন অলকের বয়স চোদ্দ পনেরর বেশী নয়। সেই বৎসর সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কলেজে ভর্ত্তি হ'য়েছে। তত্তদিনের মধ্যে কাকার কাছে কিছু চাইবার অবশ্য তা'র কখনো দরকার হয়নি, এমন কি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফী, কলিকাতায় গিয়া পরীক্ষা দেওয়া, ও অন্যান্য কোন খরচই সে বাড়ী হ'তে লয় নাই, সকল কিছুই স্কুলের পক্ষ থেকে পেয়েছিল।

এ সত্ত্বেও অলকের কাকা সকলের কাছে বল্‌তেন, অলকের জন্য তাঁ'র খরচের খরচান্ত হ'য়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে সামান্য পরিধেয় এবং দু'মুঠো আহার্য্য ছাড়া কাকার কাছ হ'তে অলক কিছুই এমন পেতনা যাতে কোরে তাঁ'র খরচান্ত হ'তে পারত। নিজের চেষ্টাতেই সে প্রবেশিকা

পরীক্ষা দেয়, কলেজের খরচও সে আপন সামান্য বৃত্তির দ্বারা ও ছ'একটা ছেলে পড়িয়ে চালাত। কোনদিন কাকার কাছে সে কিছু চায়ও নি, প্রত্যাশাও করত না। কাকার সংসারের প্রত্যেক প্রাণীকে সে অন্তরের সঙ্গে ভক্তি করত,—ভালবাসত। কাকাকে সে পিতৃতুল্য জ্ঞান করত। সে চাইত না যে, তা'র জন্য কোনরূপ অসুবিধার মধ্যে কাকা পড়েন।

সেবার কতকগুলো বইয়ের জন্য তা'র বিশেষ আটকে যাওয়ায় সে অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে প'ড়ল। পরে জননীর সাথে পরামর্শ কোরে সে অত্যন্ত শঙ্কিত ভাবে কাকার কাছে তা'র আবেদন জানায়। সেই জানানই তা'র প্রথম এবং সেই শেষ।—তা'র আবেদনের উত্তরে কাকা যা' বোলেছিলেন তা' সে জীবনে ভুলবেনা। তিনি বোলেছিলেন,

—"ভিকিরীর ছেলের অত লেখা পড়া শিখে কি হবে? যা শিখেছ যথেষ্ট। যা'র মা'কে রাঁধুনী গিরি কোরে খেতে হয়, তা'র ভিক্ষে কোরে বই কিনে পড়ার চেয়ে উপায়ের চেষ্টা করা ভালো।"

শত বিষধর কালফণী যদি এক সাথে তা'র হৃদপিণ্ডে বিষ উদ্গার করত তাহ'লেও সে অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করা হয়ত' সম্ভব হ'ত; কিন্তু কাকার উক্ত কথার উষ্ণতা কোন মতেই সে সহ্য করতে পারল না। ক্ষণকালের জন্য সে যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিল; পরে এক সময় ব্যথিত বুকখানা চেপে ধ'রে সে ছুটে পালায়।...সেইদিনই সেথাকার সকল মায়া বিচ্ছিন্ন কোরে, জননীর হাত ধ'রে আত্মাভিমানী বালক অলক এসেছিল বেরিয়ে।......

তারপর দেখতে দেখতে কালের বক্র দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে গেল

দশটি বছর। কিশোর অলক এখন জীবনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছেচে যৌবনের উপকূলে। তথাপি এখনো তা'র হৃদয়ের স্তরে স্তরে কাকার সেদিনকার কথাগুলি ব্যাথার আখরে লিপি বদ্ধ করা আছে—হয়ত' জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবে না।

ইতিমধ্যে আরো একটি দুর্জ্জয় দুর্ঘটনা তা'র জীবনের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে গেছে,—তা'কে এই বিশাল দুনিয়ার বুকে সম্পূর্ণ সহায়হীন কোরে তা'র চির দুখিনী জননী মরণের পারে বিদায় নিয়েছেন।

আজ সে বড় অসহায়—বড় একা; পৃথিবীতে তা'কে একটু স্নেহ করবার মত আজ আর কেউ নেই। অশান্ত জীবনের টানে আজ সে গা' ভাসিয়ে দিয়েছে। সে টান শেষ পর্য্যন্ত তা'কে কোথায় যে নিয়ে যাবে তা' সে নিজেই ভেবে পায় না।



(২)

তরঙ্গায়িত নদী বক্ষে নঙ্গর ছেঁড়া তরী যেমন কোরে তীরের আশায় চারিপার্শ্বের ক্ষিপ্ত বারি রাশির পানে তাকাতে তাকাতে ভেসে চলে যায় সুদূর কোন অজানার কূলে, তেমনি কোরেই চলল অলকের আকর্ষণহীন জীবন গতি সম্মুখের লক্ষ্য হারা পথে।

যা'র যেটা অভাব, সেইটা দূর করবার ব্যর্থ প্রয়াস করাই হ'চ্ছে মানুষের চিরন্তনী স্বভাব। যা' পাওয়া যায় না তার জন্যই হ'য়ে ওঠে মানুষ পাগল! তেমনি আপন বলতে যা'র কেউ নেই, সেই চায় পরকে নিবিড় ভাবে আপন কোরে বাঁধতে।...কিন্তু সেই বন্ধনের শৈথিল্য যখন তা'র কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, তখন সে হ'য়ে ওঠে দুর্ব্বার উচ্ছৃঙ্খল।...

মাতৃ বিয়োগের পর অলকও যেন কতকটা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠল। প্রথমটা অবশ্য সে স্নেহ ক্ষুধায় বুভুক্ষিত অন্তরের হাহাকার নিয়ে দ্বারে দ্বারে একটু স্নেহ, একটু মমতা, একটু ভালবাসার জন্য পাগলের মতই ছুটে বেড়িয়েছে। যেখানে একটু ভাল কথা, একটু মিষ্ট সম্ভাষণ শুনেছে সেইখানেই সে আত্মহারার মত মিশে গেছে। কিন্তু তারপর যখনি নিজের ভুলটা সে বুঝতে পেরেছে, তখনি ব্যথিত রিক্ত বুকে আরো কিছু বেদনার বোঝা নিয়ে সেখান থেকে সরে গেছে।...

কাকার গৃহ হ'তে বেরিয়ে আসার পর কয়েক দিনের মধ্যেই সে এক

ধনী মাড়োয়ারীর কাছে একটা কর্ম্মের যোগাড় কোরে নেয়, নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায়। লেখাপড়ায় তা'র সেইখানেই পড়ে যায় যবনিকা। ...তখন তা'র একমাত্র চেষ্টা এবং সাধনা হ'ল, যেমন কোরেই হোক্ তা'কে উপার্জ্জন কোরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হ'বে—তা'কে বড় লোক হ'তেই হ'বে। জন্ম দুখিনা জননীকে আর পরের বাড়ী রাঁধুনীবৃত্তি করতে সে দেবে না:—তাঁ'র অভাবের তাড়না সে দূর করবেই, তাঁকে সুখী করা তা'র প্রতিজ্ঞা।...মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই—যেখানে চেষ্টা সেখানেই সফলতা। অলকের অক্লান্ত চেষ্টা এবং সত্যতা অল্পদিনের মধ্যেই মনিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যার ফলে সে ঐ বয়সেই প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করতে থাকে। ভাগ্যলক্ষ্মীর স্নেহ কটাক্ষে দিন দিন সে উন্নতির পথে চলতে থাকে। আয়ের তুলনায় ব্যয় ছিল তা'র অত্যন্ত সামান্য—সংসারে মাত্র সে আর জননী। সুতরাং কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল ব্যাঙ্কএর সিন্দুকে বেশ মোটা হিসাবের অর্থই তা'র নামে জমা প'ড়ে গেছে। এখন তা'কে বড় লোক বল্লেও ভুল বলা হয় না।

প্রতিজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন কোরেছে! জননীর অর্থাভাব দূর কোরে তাঁ'র মুখে সে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল; কিন্তু এত সুখ তা'র অভাগিনী জননী সহ্য করতে পারলেন না,—সুখের প্রারম্ভেই তিনি আর এক অজানা মহা-সুখের আহ্বানে মরণ কোলে মুখ লুকালেন।

চলার পথে অলক খেলে আর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা! সে ধাক্কার বেগ সামলাতে তা'র অনেক দিন লাগলো। এত বড় দুনিয়াটার বুকে সে সম্পূর্ণ একা, সঙ্গীবিহীন, আপন বলতে তা'র আর কেউ নেই!—এ কথাটা যেন আরো দ্বিগুণ কোরে তা'র বুকে বেদনা ঢেলে দিলে।

সে যাতনা সহ্য করা তা'র পক্ষে কঠিন হ'য়ে উঠল। আর কোন' অবলম্বন না পেয়ে সে আত্মহারার মত কর্ম্মটাকেই আঁকড়ে ধরলে। দিন নেই, রাত নেই খালি কাজ—কাজ, আর কাজ। কাজের মধ্যেই সে আপনাকে হারিয়ে ফেলতে চায়।

অর্থাভাব তা'র নেই—দু'হাতে সে উপায় করে। পয়সার মধ্যে সে সকল দুঃখ ডুবিয়ে দিতে চায়।

কিন্তু তাও কি কখনো সম্ভব হয়?...হয় না। মানব জীবনে শুধু পয়সাটাই একমাত্র কাম্য নয়; আরো কিছু আছে। পয়সা দিয়ে বাইরের আবশ্যক মিটান চলে, মনের খোরাক পাওয়া যায় না। অন্তরের ক্ষুধা মিটাবার জন্য প্রকৃত অন্তরেরই প্রয়োজন হয়।

অন্তর ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত্ত অলকেরও পয়সার দ্বারা ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হ'ল না। একটু স্নেহ ভালবাসার জন্য সে পাগল হ'য়ে উঠল।

বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা তা'র অত্যন্ত অল্পই ছিল। যা'রা ছিল তা'দের কাছেও মৌখিক আলাপন ছাড়া বিশেষ কিছু আশা করা চলে না। তবু প্রাণের চাহিদা মিটাবার জন্য অলক তা'দেরই কাছে ছুটল।

স্বার্থপূর্ণ জগতে স্বার্থ ছাড়া কেউ চলে না...যাদের কাছে অলক রিক্ত প্রাণের হাহাকার নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল, তা'রাও তা'র মনের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে আপনাপন স্বার্থ সিদ্ধির মানসে উঠে পড়ে লেগে গেল। কারো কাছেই সে প্রকৃত দান পেল না। যা' পেলে তা'র চেয়ে না পাওয়া ভাল ছিল তা' হয়ত' সহ্য হ'ত, কিন্তু এ পাওয়ার বেদনায় সে যেন আরো অস্থির হ'য়ে উঠল।

যখনি যা'র কাছে সে গেছে, তা'কেই আপনার সামর্থ দিয়ে, অর্থ দিয়ে,—ভিক্ষা কোরেছে একটু স্নেহ, সুধু মনের পাশে একটু আশ্রয়।

কিন্তু তা'র মরুময় হৃদয়ের ব্যাকুলতা কারো প্রাণেই বাসা বাঁধতে পারেনি। তা'র গোপন দীর্ঘশ্বাসে কারো হৃদয়তন্ত্রই কেঁপে ওঠেনি। অন্তরের সুবাস সে কোথাও পায়নি।

চেনা অচেনা বহু লোকের সাথেই সে এতাবৎ মিশলে; নিজেকে নিঃস্ব কোরে তাদের মাঝে সে তলিয়ে দিয়েছে তথাপি পায়নি কিছুই। তাদের মনের তলা থেকে মনির পরিবর্ত্তে সে সুধু তুলে এনেছে নুড়ি।

...এমনি আঘাতের পর আঘাত খেয়ে খেয়ে সে আজ হ'য়ে উঠেছে উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী! জগতকে সে দেখতে শিখেছে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে। মানুষের সঙ্গ সে এখন সতত এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। কারো কাছে একটা ভাল কথা শুনলে এখন সে চম্‌কে উঠে ভাবে, নিশ্চয় এর কোন স্বার্থাভিসন্ধি আছে।

এরমধ্যে আরো এক ব্যাপার হ'য়ে গেছে—মনের খেলা খেলতে খেলতে সে এমনই উন্মত্ত হ'য়ে পড়েছিল যে, কাজ কর্ম্মের কথা এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিল। তা'র এই অলসতার পুরস্কার স্বরূপ কর্ম্ম-স্থানে জবাব হ'তেও মোটে দেরী হয়নি। তবে এ জন্য সে দুঃখিত নয়: কারণ এতদিনে যা' সে সঞ্চয় কোরেছে তা'তে কোরে একলার জীবন তা'র বেশ কেটে যাবে—সুখে সচ্ছন্দেই।...

কলিকাতার একটি সম্ভ্রান্ত পল্লীতে ছোট্ট একখানি বাড়ী ভাড়া নিয়ে সে থাকে। বাড়ীতে তা'র সবই আছে, রাঁধুনী আছে, চাকর আছে,

ঝি আছে, আসবাব পত্র, মানুষের জীবন ধারণের যা' কিছু প্রয়োজন সবই আছে,—নাই সুধু প্রাণ!

মায়ের মৃত্যুর পর হ'তে বাড়ী যেন তা'র কাছে শ্মশান তুল্য মনে হয়। তবু ঐ শ্মশানের মাঝেই সে চায় এখন সম্পূর্ণ একলা থাকতে—হৃদয়হীন মনুষ্য সমাজের তিক্ত সংসর্গ এড়িয়ে।

কয়েক মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অবশ্য এ বাসনা তা'র ছিল না। নিত্য তখন তা'র ক্ষুদ্র গৃহটী অতিথি অভ্যাগতের আগমনে সরগরম হ'য়ে থাকত। খ্যাতনামা সঙ্গীত শিল্পীদের মধুর কণ্ঠে, বাইজীদের নৃত্য গীতে ঐ শ্মশান সদৃশ গৃহ প্রাঙ্গনই মুখর হ'য়ে উঠত। খেয়ালের বশে করেনি এমন কাজ তা'র খুব অল্পই আছে। বহু গণিকার অন্ধকার অঙ্গনে সে আলোর সন্ধানে ছুটে গেছে;—অনেকেরই ক্ষুধায় সে অন্নদান কোরেছে! এখনো অনেকে তা'র দেওয়া অন্নেই প্রাণ ধারণ কোরে আছে!

এতেতেও তবু তা'র বুভুক্ষা হৃদয়ের জ্বালা জুড়ালো না। তা'র ব্যথা-দগ্ধ ক্ষতে একটু স্নেহের প্রলেপ দিতে কেউ তা'র কাছে এগিয়ে এলোনা। মনের ব্যথা মনে চেপে ক্রমে সে স'রে দাঁড়ালো, সকলের কাছ হ'তে দূরে। সে ভাবলে, দ্বারে দ্বারে স্নেহ ভিক্ষা কোরে স্নেহের বিনিময়ে গরল লাভ করার অপেক্ষা একলা থাকাই শ্রেয়!—আর কারো কাছে সে মনের কাঙালপনা দেখাতে ছুটবে না। ভুল সে আর কোরবে না।

কিন্তু ভগবানের রাজ্যে মানুষ ইচ্ছামত কাজ করতে পারে না… অলক একলা থাকতে চাইলেও, ভগবান তা'র সঙ্গীবিহীন অবস্থার

আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। কাঙাল মনের 'কাঙালপনা' দূর করতে তাই কোনক্রমেই অলক পারল না ;—ভুল আবার তাঁকে করতে হ'ল। একদিন সহসাই তা'র হ'য়ে গেল বন্দনাদের সঙ্গে আলাপ। আবার সে দিগ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে চলল,—বন্দনার কমল কলিকার মত সুন্দর চল্ চলে কচি মুখখানির 'পরে স্নিগ্ধতায় ভরা ডাগর ডাগর দুটি চোখের সরল চাউনির মাঝে আপনার বেদনাতুর প্রাণখানা মিশিয়ে দিতে। সে নাকি বন্দনার ঐ টানা টানা বড় চক্ষু দুটির মাঝে ; জননীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দেখতে পেয়েছে! তা'র ঐ নয়নের চাওয়ায় মাতৃত্ব বিচ্ছুরিত হ'তে সে দেখেছে!

অলক বিস্মিত নয়নে বন্দনাকে দেখে আর ভাবে, কোন অলক্ষ্য প্রদেশ হ'তে বুঝি দেবতা তা'র ব্যথা শুনতে পেয়েছেন ; তাই তা'র মৃত জননীর অনুরূপ অনুকরণে এই বালিকার মুখাবয়ব অপূর্ব্ব শিল্প চাতুর্য্যে বিশ্ব শিল্পী নির্ম্মাণ ক'রে তা'রই সামনে মিলিয়ে দিয়েছেন অনুকম্পা ভরে!

অদ্ভুত স্রষ্টার সৃষ্টি মহিমা! যে জননীর স্নেহ করুণ চক্ষুর দুটির সজল চাওয়া তা'র মর্ম্ম পত্রে স্মৃতির মাধুর্য্য নিয়ে আজো বেদনার রঙে রঙিন্ হ'য়ে অঙ্কিত আছে ; সেই তা'র দীর্ঘ দিনের হারান সজল-কাজল মাতৃ আঁখি, যার জন্য সে ভিখারীর মত পথে পথে ছুটে বেড়িয়েছে এই সুদীর্ঘকাল—সেই তা'র সকল চাওয়ার শ্রেষ্ঠ চাওয়া, এই দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার চোখে কেমন করে ফুটে উঠল? তা'র প্রতি বিধাতার এই অপরিসীম করুনায় মনে মনে সে তাঁকে প্রণাম জানায়।...

(৩)

কাশীপুর অঞ্চলে একটি সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে বন্দনাদের ক্ষুদ্র বসত বাড়ীটি। তারি পার্শ্বে আর একখানি বিরাট অট্টালিকা চুণ বালি খসা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাশ—পূর্ব্বে অট্টালিকাটী নাকি বন্দনাদেরই ছিল—যখন তাদের অবস্থা ভাল ছিল। তারপর তাদের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে সেটিও হস্তান্তরিত হ'য়ে যায়। কিন্তু যথা সর্ব্বস্ব হারিয়েও এখনো তা'রা পূর্ব্বকার মত বাইরের ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টা করে, যার ফলে আয় ছাপিয়ে প্রতিমাসে ব্যয় সান্না ছাড়িয়ে যায়, এবং নিত্য সকাল সন্ধ্যা পাওনাদারদের উৎপীড়নে হ'তে হয় তাদের উৎপীড়িত।

বন্দনার পিতা, বেণীমাধব গাঙ্গুলী নিকটস্থ কোন এক জমীদারী সেরেস্তায় অল্প বেতনে নায়েবী করেন। সংসারে পোষ্যের অভাব তাঁ'র ছিল না—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বিধবা একটি ভগ্নী, তা'রও দুটি নাবালক সন্তান, এ ছাড়া সাবেকী আমলের একটি বৃদ্ধা দাসী ও একটি চাকর ত' আছেই। কাজেই অর্থাভাব হওয়া তাঁ'র আশ্চর্য্য নয়।

উপস্থিত বন্দনাই তাঁ'র জ্যেষ্ঠ কন্যা। শুধু তাই নয়, প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র স্মৃতির আধার ঐটুকু। পর পর দুই তিনটি পুত্র কন্যা মারা যাবার পরে শেষ ঐ বন্দনাকেই তাঁ'র সাক্ষী স্বরূপ সংসারের বুকে রেখে তিনি মৃত্যুপারে চির বিদায় নেন। তাই 'মাতৃহারা কন্যা বোকেই

হোক্ বা প্রথমা পত্নীর স্মৃতি হিসাবেই হোক, পিতার কাছে বন্দনার আদর একটু বেশী রকমেরই ছিল।···

বন্দনার মাতার মৃত্যুর পর বেণীবাবুর আর বিবাহ করার তেমন ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু ইচ্ছা না থাকলেও জগতে মানুষকে অনেক কাজই সময় বিশেষে করতে হয়। তাঁকেও হ'য়েছিল।

বন্দনা তখন দুই বৎসরের শিশু। তাঁকে লালন পালন করার জন্যও বটে, এবং পাঁচ জনের অনুরোধ উপরোধ কোন মতেই এড়াতে না পেরে পুনরায় তাঁকে দ্বার পরিগ্রহ করতে হ'য়েছিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি দ্বিতীয় বার মালতার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সে উদ্দেশ্য তাঁর সিদ্ধ হয়নি।

স্বামী গৃহে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সপত্নী কন্যা বন্দনার 'পরে একটা স্বভাব জাত বিদ্বেষ মালতীর অন্তর প্রদেশে স্থান লাভ কোরেছিল, যে জন্য সেই প্রথম দিন হ'তেই একটা প্রবল অবজ্ঞা যুক্ত ঈর্ষার দৃষ্টিতেই সে ঐ শিশু বন্দনাকে দেখত।—

অবশ্য বুদ্ধিমতী মালতী বাইরে কোনদিন সে বিরূপ ভাব প্রকাশ হ'তে দেয়নি।...তবে অপর কেউ তা'র মনের গুপ্ত ভাব না বুঝতে পারলেও, একজন পেরেছিল; সে বালিকা বন্দনা নিজে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই সে বিমাতার প্রাণহীন মৌখিক স্নেহটা ভাল ভাবেই উপলব্ধি করতে পারত।

পিতার অত্যধিক আদর যত্নে পালিতা হ'লেও বন্দনা সে আদরের ফলে বিলাসী হ'য়ে ওঠেনি। যদিও এমন অনেক কাজই তাঁকে পিতার ইচ্ছায় করতে হ'ত যা' দরিদ্রের সংসারে সম্পূর্ণ অশোভনীয়,তথাপি ঐটুকু

বয়সেই সে পিতার মন্দ অবস্থার কথা স্মরণ কোরে কখনো তাঁকে যা' তা' আব্দারে ব্যতিব্যস্ত কোরে তুলত না। কন্যার ঐরূপ ব্যবহারের জন্য পিতাও তা'কে একেবারে নয়নের মণি কোরে রেখেছিলেন। এমন কি, বার বৎসরের কন্যার অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে সংসারের প্রতি কার্য্যে তা'র পরামর্শ নেওয়া দরিদ্র পিতা অত্যন্ত আবশ্যক বোলেই মনে করতেন। এবং ঐ 'মনে' করাটাই ছিল তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী মালতীর চক্ষুশূল।..... এক ফোঁটা মেয়ে, যা'র গলা টিপলে দুধ বের হয় এখনও, তা'র কাছে কিনা পরামর্শ নিয়ে তবে সব কাজ! এ যেন তা'র অসহ্য! —কৈ, সেও-ত' আজ দশ বছর হ'তে চল্‌ল এ বাড়ীতে এসেছে, তা'কে ত' কখনো ভুলেও স্বামী একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেন না! কেন্‌রে বাপু, সে কি এ বাড়ীর কেউ নয়?—বানের জলে ভেসে এসেছে? সেও ত' একদিন এ বাড়ীর বৌ হ'য়েই এসেছে—নারায়ণের সাম্‌নে অগ্নি সাক্ষী কোরে তা'কে আন্‌তে হ'য়েছে! না হয় সে পল্লী গ্রামের গরীব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে; খৃষ্টানা মেয়েদের মত ইস্কুল পাঠশালে গিয়ে লেখাপড়া শেখেনি!—তাই বোলে কি সংসারের একটা ভাল মন্দ বোঝবার শক্তি তা'র নেই? বার বছরের মেয়ের পরামর্শে সংসার চলবে, আর সে বাড়ীর গিন্নী, একটা কথা বলতে পারবে না! স্বামীর এই সব সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখে গা' যেন তা'র জ্বালা করতে থাকে। অথচ মুখে কিছু বলবার উপায় নেই, তা' হ'লেই আর রক্ষে থাকবে না।

সপত্নী কন্যার প্রতি স্বামীর ঐ প্রকার ব্যবহারে এবং স্নেহাধিক্যে মালতীর রাগের সীমা থাকে না।

পূর্ব্বে সে শুনেছিল, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর উপর স্বামীর একটু বেশী আকর্ষণ হয়, কিন্তু তা'র এমনি পোড়া কপাল যে, তা'র বরাতে সবই হ'ল উল্টো! স্বামী দিন রাত তা'র প্রথম পক্ষের বৌয়ের মেয়েকে নিয়েই আদিখ্যেতা করছেন। রাগ কি তা'র সাধে হয়!

সে' রাগের আধিক্যে ঐরূপ কত কথাই তা'র মনে হয়। যত দিন যাচ্ছে তত যেন আরো বেশী কোরে রাগের মাত্রা তা'র বাড়ছে। আজকাল বন্দনা যেন তা'র চোখের বিষ! কিন্তু উপায় কি...স্বামীর রক্ত নেত্র স্মরণ কোরে মনের ঝাল মনে চেপে ঐ মেয়েকেই আবার সে যত্ন আদর করতে বাধ্য হয়। মনে মনে অবশ্য এজন্য বন্দনার একটা সুব্যবস্থার ইচ্ছায় নিত্যই দু'দশ বার যমরাজ তা'র পক্ষ থেকে অনুরুদ্ধ হন।...

মালতীও নিঃসন্তান নয়—তা'রও অষ্টম বৎসরের একটি মাত্র পুত্র সন্তান মণ্টু। এই বয়সেই মণ্টুর স্বভাবের মধ্যে জননীর সব সদ্‌গুণগুলি বেশ পরিস্ফুট হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

বন্দনা যে তা'র সহোদরা ভগ্নী নয়, সে তার বৈমাত্রেয় ভগ্নী, এইটুকু বয়সেই সে' জ্ঞান তা'র বেশ পাকা হ'য়ে উঠেছে। এখন হ'তেই একটা নিদারুণ বৈরী ভাব সে বন্দনার প্রতি পোষণ করে। কেমন কোরে এবং কি ভাবে পদে পদে বন্দনাকে জব্দ করা যায় সে' চেষ্টা হ'তে সে মোটেই বিরত থাকে না। দিনের মধ্যে অন্তত দশবার কারণে অকারণে সে একটা ঝগড়া বাঁধাবার ফিকিরে বন্দনার কাছে এগিয়ে যায়; তবে বুদ্ধিমতী বন্দনা সে সুযোগ তা'কে দেয় না—শান্তভাবে ভায়ের বক্তব্যগুলি শুনে সে হাসিমুখে অন্যত্র চলে যায়, আর এই চ'লে যাওয়াটাই

মণ্টুর হয় অসহ্য। সে গজ গজ করতে করতে জননীর কাছে গিয়ে নালিশ করে! পিতার কাছে যাবার সাহস তা'র নেই, কারণ তাহ'লে পিতার বেত্র যে তা'রই পৃষ্ঠে পড়বে তা' সে ভালরূপেই জানে। সুতরাং জননী ছাড়া তা'র অন্য গতি নেই।

মণ্টুর প্রতি স্বামীর অবহেলা এবং বিমুখতা, আর বন্দনার প্রতি স্নেহের প্রাবল্য মালতীর অন্তরে যেন বিষ ঢেলে দেয়। বাস্তবিক পক্ষে স্বামীর এই অকারণ পক্ষপাতিত্বার উপযুক্ত কোন হেতুই সে খুঁজে পায় না।

...কেন যে এমনটা হয় কে জানে! অথচ ছেলে হিসাবে মণ্টু কিছু খারাপ ছেলে নয়। এই বয়সেই ছেলের বুদ্ধি কি! পড়াশুনা সেও করে। পিতার সুখ সুবিধা সেও যথেষ্ট বোঝে। না হ'লে তিন বছর পূর্ব্বে পিতা যে বই তা'কে কিনে দিয়েছেন, আজো সে সেই বই পড়ে? স্কুলের যে শ্রেণীতে যে স্থানটি প্রথম দিন তা'র জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল—আজ পর্য্যন্ত সে স্থানটি সে ছাড়েনি! কেন না পাছে তা'র জন্য পিতার কতকগুলো বাজে খরচ হয় বোলে—এমন সুবোধ ছেলের প্রতি কিনা পিতা বীতরাগ!—মেয়েই যথা সর্ব্বস্ব! কৈ আহ্লাদী মেয়ে ত' অমন কোরে পিতার মুখ চায় না। প্রতি বৎসরই কাঁড়ী কাঁড়ী টাকার বই তা'র জন্য কিনতে হয়। শুধু কি তাই, আবার বাইজীদের মত সকাল সন্ধ্যে মাষ্টারণীর কাছে গান বাজনা শেখা আছে!

মালতী ঐ সকল কথা চিন্তা করে আর মনে মনে গুম্‌রে মরে। সে ভাবে তা'র পোড়া অদৃষ্টের কথা, আর স্বামীর অবিবেচনার কথা।—ছেলে যেন তাঁ'র চোখের কাঁটা; অথচ ঐ ছেলেরই হাতে এক গণ্ডুষ

জল পেলে তবে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হবে!...আর মেয়ে, যে আজ বাদে কাল পরের ঘরে যাবে, তা'র জন্য অত কেন করা? মেয়ে কি পরকালের পথ সুগম কোরে দেবে? তবে কেন মেয়ের জন্য যে অত করা মালতী তা' কোন মতেই বুঝে উঠতে পারে না।

মাঝে মাঝে তা'র মনে হয় এজন্য সে স্বামীর কাছে কড়া স্বরে অভিযোগ করবে, কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখখানি স্মরণ কোরে মনের ভাব তা'কে মনেই দমন করতে হয়।

সংসারে এমন একটিও প্রাণী নেই যা'র সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা কয়ে মালতী একটু শান্তি পায়—এমনই কপাল তা'র! ননদ একটি আছে বটে, তবে তা'র কাছে একটি কথা বল্লেই, তখুনি সেকথা নানা আকার ধারণ কোরে স্বামীর কাণে পৌঁছে যাবে। ভাগ্য মন্দ আর কাকে বলে!...

৪

এখানি মালতীর মনের গোপন কথা, এবং নীচ স্বভাবটার পরিচয় জানতে বেণীবাবুর বাকী নেই। মালতী যে কতখানি হিংসা বন্দনার উপর পোষণ করে সেটা তিনি বুঝতে পেরেছেন ; এবং আরো জেনেছেন যে, মন্টুও মায়ের শিক্ষার গুণে কেমন তৈরী হ'য়েছে।

একে নানা অভাবের তাড়নায় দিন রাত তাঁ'র মনে এতটুকুও শান্তি নেই—আজ এ পাওনাদার, কাল ও পাওনাদার তাঁ'কে উঠতে বসতে তাগাদার পর তাগাদায় অস্থির কোরে তুলেছে, তার উপর সংসারের এই অশান্তি!...কোথায় তিনি বন্দনাকে নিয়ে একটু ভুলে থাকেন ; না তাতেও লোকের হিংসা, গায়ের জ্বালা। সময় সময় তিনি ধৈর্য্যহারা হ'য়ে পড়েন। তাঁ'র ইচ্ছা হয় মালতীকে তা'র ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যেতে বলেন। কিন্তু পারেন না সুধু বন্দনার জন্য। সেই বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁ'কে শান্ত কোরে রাখে।

পূর্ব্বে মালতীর মনে যাই থাক্, বাইরে কোনদিন সপত্নী কন্যার প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা—কি কার্য্যে, কি ব্যবহারে, প্রকাশ পায়নি। এমন কি বিমাতার টান দেখে বন্দনাই মাঝে মাঝে নিজে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেত ; এবং আপন ভ্রান্ত ধারণার জন্য লজ্জিত হ'ত। আজকাল কিন্তু মালতী আর বড় একটা চাপা-চাপির ধার ধারে না। এখন তা'র বৈরিতা ভাবে ভাষায় অনেক সময়ই বেশ স্পষ্টই প্রকাশ হ'য়ে

পড়ে। মণ্টুও সাধ্যানুযায়ী জননীর রোষ বৃদ্ধির ইন্ধনটুকু জুগিয়ে দিতে ছাড়ে না।

সেদিনও সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে মালতী বন্দনাকে বেশ রীতিমত দু'কথা শুনিয়ে দেয়। ধীর প্রকৃতি বন্দনা বিমাতার কথার কোন প্রতিবাদ না কোরে, আপন ঘরটির মাঝে বসে বসে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে থাকে।

এমন সময় বেণীবাবু বাড়ী এসে ডাকলেন—"বন্দনা!"... ত্রস্তে নিজেকে সংযত কোরে নিয়ে, চোখ মুখ বেশ ভাল কোরে মুছে ফেলে তাড়াতাড়ি বন্দনা সাড়া দিলে,

—"যাচ্ছি বাবা—"

কথা শেষের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে পিতার কাছে এসে দাঁড়াল।...আজ কয়দিন হতে বেণীবাবুর মনের অবস্থা খুবই খারাপ যাচ্ছে। পাওনাদারদের অনেক পাওনা বাকী পড়ে গেছে—সকাল বিকাল তাদের তাগাদায় প্রাণ যেন তাঁ'র হাঁপিয়ে উঠেছে। কেমন কোরে যে তিনি ঋণ মুক্ত হবেন তা' ভগবানই জানেন। ভেবে ত' তিনি কোন কূল খুঁজে পান না। তার উপর তাঁ'র সুখ দুঃখের অংশ ভাগিনী যে স্ত্রী—স্বামীর দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে যা'র চলা উচিৎ, সেই নিত্য একটা না একটা অশান্তির সৃষ্টি কোরে অকারণে সংসারের জ্বালা আরো বাড়িয়ে তুলছে।—

বন্দনার মুখের পানে তাকাতেই তিনি বুঝলেন, আজও নিশ্চয় কিছু হ'য়েছে। তিনি সস্নেহ কণ্ঠে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

—"কি হ'য়েছে মা? তোমার মুখ-চোখ অমন ফুলে উঠেছে কেন,—কাঁদছিলে বুঝি?"

বন্দনা পিতার অত্যন্ত কাছে এগিয়ে গিয়ে, তাঁ'র কাঁধের উপর একখানি হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে বল্লে,

—"না, কৈ—কিছু ত' হয়নি বাবা!—"

ম্লান একটু হেসে, কন্যার পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে আঘাত করতে করতে বেণীবাবু বল্লেন,

—"পাগলী!—ওরে তোর মনের কথা আমার কাছে কি লুকোতে পারবি!—আমি যে তোর বাপ! ছেলে-মেয়ের প্রতি অঙ্গ ভঙ্গীর তালে তালে যে বাপ মায়ের হৃদয় হাসে কাঁদে! তুই কেমন কোরে আমায় লুকোবি মা?"—

বন্দনার মাথাটি সযত্নে আপন বক্ষের মধ্যে টেনে নিয়ে তিনি বল্লেন, —"কি হ'য়েছে রে? আবার বুঝি তোর মা সেই রকম আরম্ভ কোরেছে? ...নাঃ, এর একটা ব্যবস্থা না করলে আর চলবে না। দিনের পর দিন যেন ও' বেড়ে উঠছে—আমি আজই ওকে বাপের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা কোরে তবে ছাড়ব।...কোন কথা শুনব না।"—

পিতার বক্ষ পাশ হ'তে আস্তে আস্তে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে শান্ত গলায় বন্দনা বল্লে,—"বাবা—"

—"না, না, বার বার তোমার কথা আমি রাখতে পারব না। আজ একটা বিহিত কোরে তবে অন্য কথা।—কেন রোজ রোজ এমন হবে? আমি বারণ করা সত্ত্বেও, কেন ও আবার তোমার কথায় থাকে?"

বড় বড় চক্ষুদুটি একবার পিতার রোষদীপ্ত মুখের 'পরে বুলিয়ে নিয়ে, বন্দনা বল্লে,—"আজ ত' মায়ের তেমন কোন দোষ নেই বাবা—দোষ আমারই। আমার জন্যেই মণ্টু সুধু-মুধু মায়ের কাছে কতকগুলো মার খেলে—দোষ আমার বাবা!"

বেণীবাবু তা'র পানে তাকিয়ে বল্লেন,—"অসম্ভব! তোর দ্বারা কোন অন্যায় হওয়া সম্ভব নয়। একথা আমি বিশ্বাস করব না!—আচ্ছা আমি তোর পিসাকে ডেকে জিজ্ঞেস করছি—কি ব্যাপার।"...তিনি উচ্চৈঃস্বরে ভগ্নী সুরী ওরফে সুরেশ্বরীকে ডাক্‌লেন,—"সুরী! একবার শুনে যা—"

সুরেশ্বরী নিকটেই কোথাও ছিল, দাদার ডাকে তাড়াতাড়ি এসে সেখানে দাঁড়াতেই, বেণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—"আজ ছোট বোয়ের সঙ্গে বন্দনার কি হ'য়েছে রে?"

সুরেশ্বরী একটুক্ষণ চুপ কোরে থেকে, পরে অদ্যকার বিবাদের যে বর্ণনা বিবৃতি করলে, তার মর্ম্ম এই—

বিকালে স্কুল থেকে ফিরে বন্দনা তা'র হার্ম্মোনিয়মটা ভাঙ্গা অবস্থায় বাইরে পড়ে থাকতে দেখে খুব কাঁদতে থাকে, এবং পরে যখন অনুসন্ধানে জান্‌তে পারে যে একাজ মণ্টুর, তখন সে মালতীর কাছে গিয়ে মণ্টুর কুকীর্ত্তি বর্ণনা করে। মালতী এজন্য পুত্রের পরে যৎপরনাস্তি প্রহার চালায় ও সঙ্গে সঙ্গে বন্দনাকেও—"নবাব্‌নী, রাজরাণী, বাপের আদুরে কন্যে—বাইজীদের মত গাওনাকী করছেন—কুলে কোনদিন কালি দেবেন—" ইত্যাদি নানা প্রকার গালা গালি দেয়! বন্দনা বিমাতার কটুকথার কোন প্রতিবাদ না কোরে সেই থেকে ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকে, এখনও পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করেনি।

সুরেশ্বরীর নিকটে কন্যার বিমর্ষতার কারণ অবগত হ'য়ে বেণীবাবু একটুক্ষণ চুপ কোরে থেকে সহসা চীৎকার কোরে উঠলেন,—

"কি, এত বড় কথা?—আমার মেয়ে কুলে কালি দেবে? গেঁয়ো ছোটলোক মেয়েমানুষ কোথাকার! যতকিছু বলিনা তত বাড়িয়ে তুলছে!

দাঁড়াও আজ মজা দেখাচ্ছি। আমার মেয়ে বাইজীদের মত গানই শিখুক আর যাই করুক, তাতে তোর অত মাথা ব্যথা কিসের ? আমার মেয়ে কুলে কালি দেয়, সে আমি বুঝব ! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা ?—"

বন্দনা এতক্ষণে কখন তাঁ'র পা দুটি দুই হাতে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিয়েছিল। তাঁ'কে থাম্‌তে দেখেই সে কাতর ভাবে বোলে উঠল ;

—"বাবা !"—

—"কি ?...ও, না, না আর আমি ক্ষমা-টমা করতে পারব না। তুমি আর আমাকে অনুরোধ কোরে ওর আস্পদ্দা বাড়িয়ে তুলনা বন্দনা। আমি জানি সৎমা কখনো ভাল হয় না—তোমাকেও দু' চোক্ষে দেখতে পারে না। আর কিনা ঐ সৎমার জন্যে বার বার তুমি আমায়—"

তিনি আরো হয়ত' অনেক কিছু বল্‌তেন, কিন্তু তাঁ'র কথার মাঝখানেই সুরেশ্বরী এসে খবর দিলে—"অলক ডাক্‌ছে"—

পিতা-পুত্রী একই সাথে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কে ডাকছে ? অলক ?"—

বেণীবাবুর সমস্ত রাগ নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হ'য়ে গেল, তিনি তাড়াতাড়ি অলককে ভিতরে ডাকতে গেলেন। বন্দনারও বিমাতার সপক্ষে অনুনয় কাতর মুখখানিতে সহসা আনন্দ প্রতিভাত হ'য়ে উঠল। সেও প্রায় পিতার সঙ্গেই অতিথির অভ্যর্থনায় বেরিয়ে গেল।

(৫)

পরিচয়টা তাদের অত্যন্ত অভাবনীয় রূপে, এবং কতকটা নাটকীয় ভাবেই সংঘটিত হয়।...

কয়দিন ধ'রে মনটা মোটে ভাল যাচ্ছিল না, তাই সেদিন কি মনে কোরে খামখেয়ালী অলক এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বাসে উঠে প'ড়ে একেবারে এসে নামল দক্ষিণেশ্বরে।

উদ্দেশ্য-হীন ভাবে. খানিকটা চারিধারে বেড়িয়ে সে যখন গঙ্গার ঘাটের উপর এসে ব'সল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

স্থানটি বড় নির্জ্জন!—বিশেষতঃ অলক যে স্থানটা বেছে নিয়েছিল সেখানটা এক প্রকার জনবিরল বললেও ভুল বলা হয় না।

শরতের মেঘ মুক্ত সুনীল আকাশের বুকে তখন সবে মাত্র পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে,এবং তারি প্রতিচ্ছবি জাহ্নবীর স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের সৃষ্টি কোরেছে!...মাঝে মাঝে নিকটস্থ কোন পুষ্প কানন হ'তে মৃদু মন্দ বাতাসের সাথে ভেসে আসছে নানা জাতীয় পুষ্পের সুগন্ধী!

বাস্তবিকই স্থানটি বড় মনোরম! অলকের ব্যথাতুর প্রাণে যেন ভাবের বন্যা ব'য়ে গেল। তা'র সর্ব্বহারা নিঃসঙ্গ জীবনের জ্বালাময় ক্ষতে প্রকৃতি দেবী যেন শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতির এমন অনবদ্য সৌন্দর্য্য সে বুঝি আর দেখে নাই।

অপলক নয়নে সেই স্নিগ্ধতা মণ্ডিত জোৎস্না ধারার পানে তাকিয়ে অলক কেমন যেন উদাস হ'য়ে গেল। তা'র মনে হ'ল, এখানকার প্রত্যেক ধূলিকনাতেও যেন এক স্বর্গীয় ভাব বিরাজিত!...তা'রও প্রাণে সেই ভাবের দোলা লাগলো।—

নানা চিন্তার সাথে, নিজ জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় সে আপন মনে গেয়ে উঠল,—

"জীবনের যত পূজা হ'লনা সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা——"

...সঙ্গীতের প্রতিটি বাণী, প্রতিটি ধ্বনি, প্রতিটি মূর্চ্ছনা পর্য্যন্ত তা'র মরু হৃদয়ের ব্যথার নৈবেদ্য নিয়ে সেই নিস্তব্ধ প্রকৃতির বক্ষে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো।

সর্ব্বহারা জীবনের মাঝে ভগবানের করুণার দান মাত্র ঐটুকুই সে পেয়েছিল—অতুলনীয় মিষ্ট কণ্ঠ! তাই, যখন বক্ষস্থ বেদনার বোঝা অত্যন্ত ভারী বোধ হয়, তখন ঐ সঙ্গীতের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে সে অনেকটা তৃপ্তি লাভ করে।

সেদিনেও তেম্নি অস্থির চিত্তের অসংযত চিন্তা রাশিকে সংযত করবার জন্য আপন অজ্ঞাতেই কখন তা'র কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল, তা'র ঐ দুঃখ ভোলার একমাত্র সাথী—সঙ্গীত!

মর্ম্মের সকল কথা গানের মধ্যে ফুটিয়ে দিয়ে, বাতাসের বুকে সুরের তরঙ্গ তুলে, সে গেয়ে চল্‌ল,—

"জীবনের যত পূজা হ'লনা সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

যে ফুল না ফুটিতে, ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরু পথে হারাল ধারা।
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা ॥...

জীবনে আজও যাহা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।

আমার অনাগত, আমার অনাহত
তোমার বীণা তারে বাজিছে তা'রা।
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা ॥..."

পর পর অনেকবার গানখানি গাইবার পরে যখন সে থাম্‌লো তখন তা'র চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ।...

তখনও যেন তা'র সুরের কাঁদন অনন্ত শূন্যের পথে আকুল ব্যাকুল ভাবে খুঁজে ফিরছিল আপনার পথ !

অলক আপন সুরের মাদকতায় আপনিই বিভোর হ'য়ে গিয়েছিল।... সহসা তা'র ভাবাবিষ্ট ছিন্ন কোরে দিলে অনতিদূরের কোন্ একটি বালিকার কণ্ঠ।—

—"চমৎকার, না বাবা ?"

—"চমৎকার !"...অপর একটি পুরুষ কণ্ঠ বোলে উঠল।

চম্‌কে উঠে পিছন ফিরে তাকাতেই অলক দেখলে, তা'রই অল্প দূরে একটি ভদ্রলোক পার্শ্বোপবিষ্ট। একটি বালিকার স্কন্ধে হাত রেখে নীরবে বসে আছেন।

অলকের মুখে কেমন একটু বিরক্তি প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠল। সে

চাইছিল একটু নির্জ্জন স্থান। সহসা তাঁদের এই উপস্থিতি তা'র মোটেই ভালো লাগলো না।

কিছুক্ষণ চুপ কোরে বসে থেকে সে কি ক'রবে, ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়াল। অল্প কয়েক মিনিট ইতস্ততঃ একটু বেড়িয়ে সে ফিরবে ফিরবে ভাবছে, ঠিক সেই সময় পিছন হ'তে একটা হুড়মুড় শব্দ শোনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্তনাদ ;—

"বাবা গো—"

আচম্বিতে স্বরটা কাণে যেতেই অলক সচকিত হ'য়ে উঠল। পিছনে তাকাতেই সে দেখলে, দুটো ষাঁড়ে ভীষণ লড়াই করতে করতে এগিয়ে এসে পড়েছে একেবারে সেই পূর্ব্ব-বর্ণিত বালিকাটীর প্রায় ঘাড়ের উপর, আর তা'র পার্শ্বের ভদ্রলোকটি অচৈতন্য অবস্থায় সেইখানে গড়াচ্ছেন! সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই তিনি আহত হ'য়েছেন।

মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না কোরে অলক তৎক্ষণাৎ সেথায় ছুটে গেল। অসীম সাহস ভরে, যুদ্ধ রত ষাঁড় দুটির সম্মুখ হ'তে সে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে বালিকাটীকে ও লোকটিকে সেস্থান হ'তে সরিয়ে নিয়ে এলো—চক্ষের নিমিষে। আরো সৌভাগ্য ; সেই সঙ্গে ষণ্ডদ্বয়ও যুদ্ধান্তে বিপরীত মুখে ছুটতে আরম্ভ কোরে দিয়েছে।

......আকস্মিক বিপদে শঙ্কিত বালিকাটীও তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল :...

অলক কি করবে ভেবে পেলে না। কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়বৎ কিয়ৎকাল দাঁড়িয়ে থেকে সে ছুটল গঙ্গায় জল আনতে। নিজ পরিধেয় বস্ত্রের কতকাংশ ভিজিয়ে নিয়ে এসে সে তাদের মুখে চোখে দিতে লাগলো।

অনেকটা সময় ঐ ভাবে শুশ্রূষার ফলে ধীরে ধীরে বালিকার জ্ঞান ফিরে এলো। ভীতি বিহ্বল নয়ন দুটি উন্মীলিত কোরে সে একবার চারিধারে তাকিয়ে শিউরে উঠে পুনরায় মুদ্রিত কোরে নিলে—হয়ত' বা ক্ষণ-পূর্ব্বের বিপদ স্মরণ কোরে।

আরো অল্প সময় ঐ ভাবে কাটার পর, কতকটা সামলে নিয়ে বালিকা উঠে বসল। অলকের পানে তাকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে,—"বাবা—?"

তা'কে আশ্বাস দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে অলক তা'র কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই বল্লে,—"ভয় নেই, তোমার বাবা এখুনি সেরে যাবেন।—আঘাত অল্পই লেগেছে, কিছু ভয় নেই।"..

ভয় কিছু না থাকা সত্ত্বেও কিন্তু ভদ্রলোকের সংজ্ঞা শীঘ্র ফিরল না, এবং যখন ফিরল, তখনও উত্থান শক্তি এক প্রকার নাই বল্লেই হয়।

প্রথমে অলক ভেবেছিল, আঘাত তেমন গুরুতর নয়—ভয়েতেই লোকটী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। এখন আঘাতের গুরুত্বটা তা'র চোখে পড়তে সে বিশেষরূপ চিন্তিত হ'য়ে প'ড়ল। রাত্রিও ক্রমে বেড়েই চলেছে;—এ ভাবে আর কতক্ষণ এখানে থাকা চলে! অথচ এরূপ অবস্থায় তাঁ'দের ফেলেই বা সে যায় কেমন কোরে!

...যাই হোক্! ঐ সব চিন্তা করতে করতে এক সময় সে কর্ত্তব্য স্থির কোরে ফেল্লে।

ভদ্রলোককে তাঁ'র বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করায় যখন জানা গেল, তাঁ'র বাড়ী কাশীপুরে, তখন অলক একখানা নৌকা ভাড়া কোরে, তাঁ'কে

গৃহে পৌঁছে দেওয়াই যুক্তি যুক্ত মনে করলে। লোকটীও তা'র পরামর্শে কৃতজ্ঞতার সহিত সম্মতি জানালেন।

আর মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না কোরে তখনই অলক একখানা নৌকা ভাড়া কোরে, মাঝীর সাহায্যে তাঁ'কে নৌকায় তুলে, তাঁ'দের নিয়ে কাশীপুর অভিমুখে নৌকা খুলে দিলে।...

বলা বাহুল্য, ঐ আহত ভদ্রলোকটীই বেণীমাধব গাঙ্গুলী এবং বালিকাটী তাঁ'র কন্যা—বন্দনা।

সাংসারিক নানা কারণে কয়দিন ধ'রে মনটা অত্যন্ত চঞ্চল থাকায় সেদিন তিনি কন্যা সহ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে বেড়াতে এসে উক্ত বিপদে পতিত হন। তারপর অলকের অযাচিত সাহায্যে আহত অবস্থায় গৃহে নীত হন।

এই ব্যাপারের পর হ'তেই অলকের সাথে বেণীবাবুর ও তাঁ'র পরিবারের একটা ঘনিষ্ঠতা স্থাপন হয়।

সুধু তাই নয়, ক্রমে ইহাও প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ল যে, অলক বেণীবাবুর নিতান্ত পর নয়—একটা সম্পর্কও তাঁ'দের মধ্যে আছে। বেণীবাবুর দুর সম্পর্কীয় এক মাতৃস্বসার পুত্র এই অলক,—সম্পর্কে তাঁ'র ভ্রাতা! সম্পর্কটী প্রকাশ হবার পর হ'তেই ঘনিষ্ঠতা আরো তাঁ'দের বেড়ে গেল।

যা'র যেটা নেই, সে সেইটার জন্যই হয় পাগল! বেণীবাবুরও কোন সহোদর না থাকায় তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। 'দাদা' ডাক শুনতে তাঁ'র বড় ভালো লাগত। তাই অলককে এইভাবে কনিষ্ঠ-রূপে পেয়ে, ভায়ের অভাব তাঁ'র অনেকটা পূর্ণ হয়। যার জন্য অল্প

দিনের মধ্যেই তিনি অলককে একান্ত আপনার কোরে কাছে টেনে নিলেন।

স্নেহ ভিক্ষুক অলকও জীবনে এতটা কোথাও পায়নি, তাই সেও বেণীবাবুর স্নেহের মাঝে আপনাকে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেল্‌লে।...তবে বেণীবাবুর স্নেহ অপেক্ষা আরো একটি নিবিড়-স্নেহ-বেষ্টনী তা'কে একেবারে পঙ্গু কোরে ফেলেছিল। যা'র স্নেহ-কারায় বন্দিত্ব লাভ কোরে সে কায়মনে ভগবানকে নিত্য শত সহস্র ধন্যবাদ জানায়, সে কারার মালিক অপর কেউ নয়, বেণীবাবুর একমাত্র বালিকা কন্যা বন্দনা।

৬

কয়েক মাসের মধ্যেই বেণীবাবুর সংসারে অলক কুমার বেশ রীতিমত আধিপত্য বিস্তার কোরে ফেল্‌লে।...

অলক ব্যতীত বেণীবাবুর কোন কার্য্যই হয় না। অত্যন্ত সামান্য বিষয়েও অলকের পরামর্শের প্রয়োজন হয়। বন্দনার গান-বাজনা, লেখাপড়া ইত্যাদি সকল কিছুরই ভার অলকের উপর। অলক না হ'লে বন্দনার চলে না। অলকের শিক্ষা, অলকের উপদেশ, বন্দনার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অলকের আদেশ সে দেবতার আদেশের মতই পালন করে।

অলকের প্রতি কন্যার এই অনুরাগ বেণীবাবুকে যথেষ্ট আনন্দ দান করত'। কারণ এটা তিনি বুঝেছিলেন যে, অলকও কতখানি স্নেহ তাঁ'র মাতৃহারা কন্যাকে করে।

না পাওয়া জীবনে সহসা ভগবানের এতখানি দান অলক কুমারকেও দিশেহারা কোরে দিয়েছিল। স্রোতের জলে ভেসে যাওয়া কুটার মত সেও তা'র মরুদগ্ধ প্রাণখানা নিয়ে তলিয়ে গেল বেণীবাবু এবং বন্দনার স্নেহ পারাবারের অতল তলে।

গৃহের সকল প্রাণীই অলককে একান্ত আপনার কোরে কাছে টেনে নিয়েছিল,—পারেনি কেবল মালতী।......প্রথম প্রথম অবশ্য অলকের

সৌম্যমূর্ত্তি এবং মিষ্ট আলাপন মালতীকে খুবই আকৃষ্ট কোরেছিল,—তা'র গোপন মনের কোণে একটা সুপ্ত কামনা সাড়া দিয়ে উঠেছিল; কিন্তু যখন সে বুঝলে, সামান্য মুখের আলাপন ছাড়া আর কিছুই অলকের কাছ হ'তে পাওয়া তা'র পক্ষে সম্ভব হবে না—বন্দনা অলকের সমস্ত মনটা অধিকার কোরে বসেছে, তখন হ'তে তা'র প্রকৃতিগত-হিংসার দৃষ্টিতেই অলক পতিত হ'ল।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার ভাবে ইঙ্গিতে মালতী তা'র অন্তরের তীব্র কামনা অলকের নিকট ব্যক্ত কোরেছে, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। অলক মালতীর কুৎসিত ইঙ্গিতের প্রশ্রয় কোনদিন দেয়নি। যার ফলে অলকের প্রতি একটা নিদারুণ প্রতিহিংসা বাসনা আজ মালতীর অন্তরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। অলকের যখন তখন আসা যাওয়া মোটেই তা'র প্রতিপ্রদ নয়। অথচ তা'কে বাধা দেবার মত ক্ষমতাও তা'র নেই।

একটা প্রবাদ আছে,—'নারীর মন নাকি দেবতাদেরও অগোচর!' বাস্তবিক কথাই—কোমল স্বভাবা নারী যেমন একদিকে অকৃপণভাবে স্নেহ বিলাতে পারে, তেমনি আবার অতৃপ্ত কামনার জ্বালায় হিংস্র পশুর মত অতিহীন ব্যবহার করতেও তাদের বাধে না—অন্তরের ক্ষিপ্ততায় সকল প্রকার নিষ্ঠুরতাই তাদের পক্ষে তখন সম্ভবপর হয়। মাতৃজাতি এই নারীই সংসারের সকল অমঙ্গল দূর কোরে আনন্দের প্রবাহ এনে দেয়,—জ্বেলে দেয় শান্তির স্নিগ্ধ ধূপ; আবার অনেক সংসারে এই নারী হ'তেই জ্বলে ওঠে অশান্তির দাবানল।...বাস্তবিকই নারী-অন্তর মানবের অবোধ্য!...

হিংসা প্রবণা মালতী যেদিন হ'তে বধূরূপে বেণীবাবুর সংসারে

আবির্ভূতা হ'য়েছে সেইদিন হ'তেই তাঁ'র পারিবারিক শান্তি হ্রাস পেতে আরম্ভ কোরেছে।

মালতী চাইত, গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্রী হ'য়ে সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে—স্বামীকে নিজের মতে চালনা করতে ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও তা' সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। তাই তা'র হিংসানলে গৃহের সকল শান্তি দগ্ধ হ'য়ে যায়।

তবে এ কথাটা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারেনি, এমন কি মালতীর নিজের কাছেও অজ্ঞাত ছিল যে, একটা তীব্র কামনার ক্ষুধা তা'র মনের মাঝে ঘুমিয়ে আছে। সেটা তা'র কাছে সেদিন সহসাই প্রকাশ হ'য়ে পড়ল, যেদিন সে তা'র দৃষ্টির সম্মুখে দেখতে পেলে প্রিয় দর্শন যুবক অলককে। এতকাল যে ক্ষুধিত কামনা ঘুমন্ত অবস্থায় তা'র অন্তর তলে বাসা বেঁধে ছিল, অকস্মাৎ সেদিন জাগরিত হ'য়ে উঠল অলককে দেখে। অন্তরস্থ গোপন লালসার বার্ত্তা জান্‌তে পেরে সেদিন সে নিজেও কম বিস্মিত হয়নি। কিন্তু বিস্মিত হ'লেই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন হয় না। মালতীরও হয়নি ; সে তাই কৌশলে অলকের অন্তর জয় কোরে তা'র ক্ষুধা মিটাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু স্নেহ ভিক্ষারী অলকের কামনা ছিল অন্য প্রকার, এবং সে কামনা তা'র বন্দনা ও বেণীবাবুর কাছে মিটেছিল ; তাই মালতীর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে গিয়েছিল। কোনরূপ ছলনাতেই সে অলককে বশীভূত করতে পারেনি।...

...এ বাড়ীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে মালতীর প্রতি একটা কেমন বিশ্রী মনোভাব অলকও অন্তরে পোষণ করতে আরম্ভ করে। যার জন্য

কোনদিন সে তা'কে সুনজরে দেখতে পারেনি। অবশ্য প্রথমে সে মালতীর অন্তরিন্দ্রিয়ের কু অভিসন্ধি বা দুষ্ট অভিলাষ বুঝতে পারেনি—যদিও বহুবার আভাষে ইঙ্গিতে সে মালতীর দিক্ হ'তে তা'র মনোবাঞ্ছা বোঝবার সুযোগ পেয়েছে, তবুও সে বুঝতে চেষ্টা করেনি। তবে মালতীও ছাড়বার পাত্রী নয়—সেও মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প কোরেছিল, যেমন কোরেই হোক্ অলককে হস্তগত কোরে তা'র অভিলাষ পূর্ণ করবে! এর জন্য সকল প্রকার লাঞ্ছনা, সকল প্রকার শাস্তিই সে বহন করতে প্রস্তুত। স্বামী তা'কে হতাদরে চিরদিন দূরে দূরে রেখে দিয়েছে, সে তার প্রতিশোধ নেবে।

কিন্তু অলক তা'কে প্রতিশোধ নেবার কোন সুযোগই দিলে না। তা'র কামনা জড়িত সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

যখন সে বুঝলে অলককে পাওয়া তা'র পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব,—অলকের সারা প্রাণ বন্দনাময়,—উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই তা'র কাছ হ'তে সে পাবে না, তখন তা'র অন্তরে জ্বলে উঠল প্রতিহিংসার জ্বালাময়ী বহ্নি। সে প্রতিজ্ঞা করলে—এ' উপেক্ষার শাস্তি অলককে সে দেবেই দেবে,—বন্দনার সাথে অলকের বিচ্ছেদ সে ঘটাবেই। এ বাড়ীতে আসা তা'র যেমন কোরেই হোক্ সে বন্ধ করবে! সে অনেক কিছুই হয়ত অলকের জন্য, করতে পারত, প্রাণভরা ভালবাসা সেও দিতে পারত; কিন্তু অলক তা'কে উপেক্ষা কোরেছে। ভবিষ্যতে এর জন্য অলককে অনুতাপ করতে হবে।

সেই হ'তে মালতী প্রতি পদে অলককে বিপন্ন করবার চেষ্টায় চেষ্টিত

হ'য়ে আছে। কোনরূপে সামান্য একটু ছিদ্র পেলেই সে তাঁকে আক্রমণ করতে ছাড়ে না।

তবে গৃহকর্ত্তা যাঁ'র সহায় তাঁকে বিপদ্গ্রস্ত করা সহজ সাধ্য নয়; তাই মালতীর কোন আক্রমণই কার্য্যকরী হয় না।..

৭

অলক বন্দনাকে ভালবাসে! সুধু যে ভালবাসে তা নয়, তা'র সে ভালবাসা বারিধির মত অতলস্পর্শী—আকাশের মত অন্তবিহীন—ভাস্করের মত প্রদীপ্ত—চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ—প্রকৃতির মত উদার! তা'র সে ভালবাসায়, প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস নেই, তরঙ্গের আলোড়ন নেই, মার্ত্তণ্ডের উষ্ণতা নেই! সে ভালবাসা নিষ্কাম, নির্ম্মল, স্বর্গীয়, পবিত্রতায় সুরভিত!

বন্দনাকে সে যা' দিয়েছে তার তুলনা হয় না। হৃদয়ের সকল সঞ্চিত সম্পদই সে তা'কে উজাড় কোরে ঢেলে দিয়েছে।

বন্দনাও কার্পণ্য করেনি। সেও তা'র শিশু অন্তরের সকলটুকু দানই অলককে ধ'রে দিয়েছে।

পরস্পরের সম্বোধনটুকুও তাদের বড় মধুর। যদিও সম্পর্ক হিসাবে অলক বেণীবাবুর ভ্রাতা, এবং সেই সম্পর্কে বন্দনার তা'কে কাকা বোলেই ডাকা উচিৎ ছিল, কিন্তু সে সম্পর্কের পরিবর্ত্তে তা'রা আরো এক মধুরতম সম্বন্ধ পরস্পরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা কোরেছিল। যে সম্বন্ধের মধুরতায় বিশ্ব প্লাবিত, যে সম্বন্ধ চির অকলঙ্কিত এবং শাশ্বত, সেই মাতা পুত্রের সম্বন্ধই তা'রা নির্ব্বাচন কোরে নিয়েছিল। অবশ্য অপরের কাছে এটা যেন কেমন খাপছাড়া গোছের দেখায়, কেন না অলক একজন পূর্ণ বয়স্ক যুবক, আর বন্দনা নিতান্ত বালিকা, মা' হবার সময় এখনও তা'র মোটেই হয়নি। তথাপি নারী জাতির জন্মগত অধিকার নিয়ে, এবং সর্ব্বহারা

অলকের মনস্তুষ্টির জন্য সে তাঁকে সন্তানের স্থানই দিয়েছিল। অলকও এই ক্ষুদ্র মেয়েটিকে মাতৃত্বের মর্য্যাদা দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে।

অলক বন্দনাকে 'মা' বোলে ডাকে। বন্দনা প্রথমে অলককে 'ছেলে' বোলেই ডাকত, কিন্তু অলক তাতে আপত্তি করায় এখন সে তা'র নাম ধ'রেই ডাকে।...

অলক এবং বন্দনার পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহপূর্ণ সম্বোধন বেণাবাবুর অন্তরে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেয়। মাঝে মাঝে কৃত্রিম অভিযোগ সহকারে কন্যাকে তিনি বলেন,

—"মা আমার নূতন ছেলে পেয়ে পুরোণো ছেলেকে একেবারে ভুলেই গেল!"

পিতার কথায় লজ্জিত হ'য়ে বন্দনা তাঁ'র কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে। অলক উচ্চ হাস্য কোরে বলে,—"তা হবেনা! আমি যে মায়ের ছোট ছেলে। ছোট ছেলের উপরেই যে চিরকাল মা বাপের টান একটু বেশী হয়, তা' কি আপনি জানেন না?"

সুরেশ্বরীও সময় সময় তাঁ'দের আলোচনায় যোগ দিয়ে বলেন,

—"ঐ ত' এক ফোঁট্টা বাচ্ছা মা', তা অমন বুড়ো বুড়ো দুটো ছেলেকে কি কোরে সাম্‌লাবে বাপু! এ যে তোমাদের অন্যায় আব্দার!"

অলক সঙ্গে সঙ্গে বলে,—"বা-রে! মায়ের কাছে বুঝি আবার ছেলে কখনো বুড়ো হয়!"...বন্দনাকে লক্ষ্য কোরে সে জিজ্ঞাসা করে,—"হ্যাঁ মা? আমরা তোর বুড়ো ছেলে?"

বন্দনা লজ্জায় মুখ রাঙা কোরে বোলে ওঠে,—"যাঃ!"

বন্দনার কথায় ঘর সুদ্ধ লোক হো হো কোরে হেসে ওঠে। মালতীর কর্ণে সে হাসির শব্দ যেন বিষমাখা শরের মতই আঘাত হানে। সর্ব্বদা গৃহের সকল প্রকার আলোচনা হ'তে নিজেকে সে দূরে দূরে রাখবার চেষ্টা করে। কারণ তা'র মনে হয় গৃহের সকল প্রাণীর প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গী পর্য্যন্ত যেন তা'র বিপক্ষে কটাক্ষ হান্‌ছে। বিশেষ কোরে অলকের দৃষ্টি, অলকের কণ্ঠ সে কোনমতেই সহ্য করতে পারে না। তা'কে দেখ্‌লে তা'র সারা দেহময় যেন অগ্নিবৃষ্টি হ'তে আরম্ভ হয়।

অলক বন্দনাকে ভালবাসে, এ কথাটা চিন্তা করতেই মালতীর কষ্ট বোধ হয়। বন্দনার সাথে অলক হাসে, কথা কয়, অবাধে মেলামেশা করে, এ দৃশ্য যতই মালতী দেখে, ততই সে আরো ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে; অথচ এর প্রতিকার করবার সামর্থও তা'র নেই। মাঝে মাঝে রাগের আধিক্যে সে গৃহবাসীদের শুনিয়ে শুনিয়ে আপ্‌না আপ্‌নি গজ্‌গজ্‌ করতে থাকে।...

—"এ বাড়ীর দেখ্‌ছি সবই বিচ্ছিরী! বলব না মনে করি, না বোলেও আবার থাকৃতে পারি না;—একটা ধিঙ্গী তের চোদ্দ বছরের মেয়ের সঙ্গে, একটা দাম্‌ড়া ছোড়া দিন রাত মুখোমুখী হ'য়ে হাসি তামাসা কোরছে। আর তাই দেখে শুনে বাড়ীর লোকেদের আদিখ্যেতা কত! ছি, ছি! লজ্জাও করে না? আবার বলতে গেলে সব অগ্নিশর্ম্মা! ছোড়ার আবার ন্যাকামোর ডাক্‌ শুনে বাঁচি না—"মা"! মা' না ছাই!—বুঝবে পরে, যেদিন একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড হ'বে। আমার আর কি!"—

এই ভাবের কত কথাই সে সুরেশ্বরী ইত্যাদিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। অবশ্য বেণীবাবুর সমক্ষে এসব কথা বলবার মত সাহস তা'র কোনদিন

ছিলও না বা এখনো নেই। শ্রোতাদের মধ্যেও কেউ একথা তাঁ'র কানে তোলে না।

অসহ্য হ'লে সময় সময় সুরেশ্বরী মালতীর কথার এবং মন্দ ইঙ্গিতের প্রতিবাদ কোরে বলে,—"ও কথা বোল না বৌদি,'—পাপ হবে! মানুষকে অত ছোট কোরে দেখতে নেই। আহা! ছেলেটার পৃথিবীতে আপনার বলতে কেউ নেই। তার ওপর বন্দনার মুখখানা নাকি ঠিক ওর মায়ের মত; তাই ওকে মা বোলে, ওর সঙ্গে একটু কথা কয়ে ও আনন্দ পায়। আর ছেলে হিসেবেও ও খুব ভাল ছেলে;—ওর বিষয় অমন যা' তা' কথা বলা তোমার মোটেই উচিৎ নয় বৌদি'। দাদা যদি কোন রকমে এসব কথা শুনতে পায়, তা'হলে আর রক্ষে থাকবে না। দাদা ঠিক ছোট ভায়ের মতই ওকে ভালবাসে। তার ওপর ও ত' একেবারে আমাদের পরও নয়—ওর মায়ের কাছে ছেলে বেলায় আমরা অনেক স্নেহ পেয়েছি।—"

—"আচ্ছা গো আচ্ছা, ও তোমাদের খুব আপনার লোক, আমিই পর। আমার আর কি; নিজেরাই বুঝবে। গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগবে!"...মালতী গজগজ করতে করতে অন্যত্র চলে যায়—।

...সুরেশ্বরীর এক বালবিধবা ননদ আজ প্রায় দুই মাসকাল ধ'রে এখানে আছে। নাম তা'র ছায়া। প্রকৃতই সে বেদনার ঘন ছায়া! যৌবন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই তা'র জীবনের সকল আনন্দ দেবতার কঠিন কটাক্ষে দগ্ধ হ'য়ে গেছে। অলকের মত সেও সর্ব্বহারা। অল্প বয়সেই পিতা মাতা তা'র বিবাহ দিয়েছিলেন। তখন তা'র বয়স ছিল মাত্র বার বৎসর। ধনী এবং চরিত্রবান্ পাত্র পেয়ে, বিনা ব্যয়ে পিতা মাতা

কন্যাটীকে ঐ বয়সেই পাত্রস্থা কোরেছিলেন। ভেবেছিলেন, কন্যা সুখী হবে। কিন্তু বৎসর না ঘুরতেই তাঁদের সকল আশা চূর্ণ হ'য়ে গেল। দেবতার অভিশাপে বালিকা ছায়ার সীমন্তের সিন্দুরটুকু চিরতরে লুপ্ত হ'য়ে গেল। ঐশ্বর্য্য আর দাস-দাসী ছাড়া স্বামীর সংসারে তা'র আপন বলতে আর কেউ রইল না।

স্বামীর মৃত্যুর পর বছর তুই ছায়া পিত্রালয়ে ছিল। তারপর পিতা মাতাকেও হারিয়ে ফেলে সে ফিরে আসে তা'র জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ স্বামীর ভবনে। মাণিকতলা বাজারের অল্প একটু দূরেই ছায়ার স্বামী-গৃহ।

ভগ্নীর এই বিধবা বালিকা ননদটীকে বেণীবাবু যথেষ্ট স্নেহ করেন। এমন কি উপর পড়া হ'য়ে তা'র সম্পত্তির অনেক কাজই তিনি কোরে দেন।

সুরেশ্বরী মাঝে মাঝে তা'কে আপনার কাছে এনে রাখে। সুরেশ্বরীও আজ প্রায় দশ বৎসর বৈধব্যের জ্বালা বুকে নিয়ে তুটি নাবালোক সন্তানের হাত ধ'রে ভাইয়ের আশ্রয়ে এসে উঠেছে। তা'রও শ্বশুর বাড়ীর সম্পর্কে একমাত্র ঐ ননদটি ছাড়া আর তেমন কেউ নেই। তাই ননদটিকে সময় অসময়ে সে কাছে নিয়ে আসে। আবার নিজেও কখনো কখনো তা'র কাছে গিয়ে তু'দিন থেকে আসে।

এতেও মালতীর গাত্রদাহ বড় কম ছিল না। সে যে কি চায় এবং কিসে সন্তুষ্ট হয় তা' বুঝে ওঠা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

ছায়াকেও মালতী কোনদিন প্রীতির চক্ষে দেখেনি। ইদানী আরো দেখতে পারে না। ইদানী দেখতে না পারার কারণ অবশ্য যথেষ্ট ছিল ;—

ছায়া ইতিমধ্যেই অলকের সাথে আলাপ কোরে নিয়েছে। অলককে সে ভক্তি করে, ভালবাসে। যেদিন সে অলককে প্রথম দেখে, সেদিনেই একটা শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালবাসার অর্ঘ আপন অজ্ঞাতেই সে অলককে দান কোরে ফেলে! ছায়ার এই ষোল সতের বৎসর জীবনের মধ্যে এমন কোরে ভালবাসার অবসর তা'র কখনো আসেনি।

তা'র সেই ভালবাসার মধ্যে কোনরূপ উত্তেজনা ছিল না। তা'র আনন্দ শুধু ভালবেসে। তাতেই তা'র শান্তি।—প্রতিদানের আশা রেখে সে অলককে ভালবাসেনি।

অলকেরও এই শান্ত সরল মেয়েটিকে খুব ভাল লাগে। তা'র বেদনা কাতর চক্ষু দুটির পানে তাকালে, অন্তরে সে ব্যথা অনুভব করে।

তা'র সাথেও অলক প্রাণ খুলে মেলামেশা করে। কাজেই এতে যে মালতীর রাগ হবে সে আর বেশী কথা কি?

গৃহবাসীদের কারো প্রতিই যে মালতী সন্তুষ্ট নয়, এবং অলকের প্রতি তা'র মনোভাব কিরূপ, সেটা বুদ্ধিমতী ছায়ার জানতে হয়ত' বাকী নেই; তাই যখন মালতী ঐরূপ গজগজ ক'রতে ক'রতে চলে যায়,—"গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগবে—" তখন ছায়া তা'র গমন পথের পানে তাকিয়ে স্বগত ভাবে বলে

—"বাসি যদি তুমি কর তবেই হ'বে, না হ'লে নয়।"

মালতীর দৃষ্টিতে সে কি দেখেছিল তা' সেই জানে; যাতে কোরে মালতীকে সে রীতিমত সন্দেহের চক্ষে দেখে। মালতীও তা'কে সন্দেহ

করতে ছাড়ে না। নিজের মনের মাপকাঠী দিয়ে সে সকলের মনের হিসাব কষে। ভালবাসার অর্থ তা'র কাছে অন্যরূপ।

অলকের সাথে কথা বলতে ছায়ার আনন্দ হয়, অলকের বিষয় আলোচনা করতে সে খুব উৎসাহ প্রকাশ করে। অলকও ছায়াকে মালতীর মত উপেক্ষা না কোরে, বেশ সহজভাবেই তা'র সাথে কথা-বার্ত্তা বলে—তা'কেও অলক স্নেহ করে। অথচ মালতী এতদিনের মধ্যে অলকের কাছ হ'তে কিছুই তেমন পায়নি। কথা মালতীর সাথেও সে বলে বটে, তবে তাতে প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায় না। মালতীর ক্ষুধা তাতে মেটে না।

একে বন্দনা অলকের সমস্ত অন্তরটাই জয় কোরে বসেছে। তা'র উপর আবার এই ছায়ার উৎপাত! মালতী যেন ক্ষেপে উঠবার উপক্রম হ'য়েছে।......

দিনের অধিকাংশ সময় এখন অলকের বন্দনাকে নিয়েই কাটে। সহরের সকল দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে প্রায়ই তা'রা যায়। বন্দনার বেড়াবার আগ্রহ খুব বেশী, তাই আজ এখানে, কাল সেখানে এইরূপ ঘুরে ঘুরে অলক বন্দনার আনন্দ উৎপাদনের চেষ্টা করে। ছায়া এলে সেও তাদের সাথী হয়।

পূর্ব্বে বন্দনা বেড়াতে ভালবাসে বো'লে বেণীবাবু তা'র পক্ষ হ'তে যখন তখন অনুরুদ্ধ হ'তেন, এবং নিজের কাজের ক্ষতি কোরেও তাঁ'কে বাধ্য হ'য়ে কন্যাসহ এখানে সেখানে যেত হ'ত। এখন অলক তাঁ'কে রেহাই দিয়ে, নিজে সে ভা'র নিয়েছে। বন্দনাও এখন অলক ছাড়া কোথাও যেতে চায় না।

বাসার সঙ্গে সম্পর্ক আজকাল অলকের খুব অল্পই। মাত্র দু'বেলা একবার কোরে গিয়ে দু'মুঠো খেয়ে আসা, আর রাত্রি বারটার সময় গিয়ে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করা ব্যতীত বাসায় সে বড় একটা যায় না। ওটুকু সময়ও যাবার ইচ্ছা তা'র থাকে না,—তবে না গিয়ে পারে না, চক্ষুলজ্জার খাতিরে। তাও বেণীবাবু এবং বন্দনার অনুরোধে মাসের মধ্যে অন্তত দশদিন তা'র বাসায় যাওয়া ঘটে ওঠে না—এইখানেই আহারাদি ও রাত্রি যাপন তা'কে করতে হয়।

এর ভিতর বেণীবাবুদের দিক্ হ'তে সে বাসা তুলে দিয়ে এখানে এসে থাকবার জন্যও বহুবার অনুরুদ্ধ হ'য়েছে, কিন্তু তা'তে সে রাজি হয়'ন; কেন তা' সেই জানে।

(৮)

তখনো সন্ধ্যার কিছু বিলম্ব ছিল। শরতের মেঘ-মুক্ত সুনীল আকাশ বুকে দিন শেষের শেষ অভিনন্দন রেখে তখন সবেমাত্র দিনকর বিদায় নিয়েছেন। নগরীর প্রাসাদ শিখরে শিখরে অস্ত গত-রবি-রশ্মির ম্লান আভাখানি তখনো বিলুপ্ত হ'য়ে যায়নি।...

অলক বন্দনাদের গৃহ প্রাঙ্গনে এসে ডাক্‌লে,—"মা —ওমা !"

সুরেশ্বরী কক্ষান্তরাল হ'তে বেরিয়ে এসে ব্যগ্রতা সহকারে প্রশ্ন করলে, —"সারাদিন আজ আসোনি কেন অলক ?"

অলক মৃদু হাস্যে বল্লে—"আজকে সকালের দিকে হঠাৎ ছায়ার কথা মনে পড়ে যাওয়ায়, তা'র বাড়ীতে গিয়েই সমস্ত দিনটা আটকা পড়েছিলুম। অনেক দিন যাইনি কিনা ; তাই কিছুতে আর ছাড়তে চায় না।"...... সুরেশ্বরীর পানে তাকিয়ে সে হাসতে লাগল।

সুরেশ্বরী একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বল্লে—"তাই ভালো ! আমরা ভাবলুম, বুঝি অসুখ বিসুখই করল ! যা' দিন কাল পড়েছে, বলা ত' কিছুই যায় না—হ'লেই হ'ল।"

—"না, না, অসুখ করবে কেন ?"...একবার চারিধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে অলক জিজ্ঞাসা করলে,—"মা কোথায় ? মাকে দেখছিনা যে ?"

সুরেশ্বরী হাসতে হাসতে বল্লে.—"মাকে আজ আর পাচ্ছ না ভাই ;

—মাকে নিয়ে মায়ের বড় ছেলে আজ পালিয়েছে। মায়ের শূন্য স্থান আজ বোনকে নিয়েই পূর্ণ করতে হবে।"

বিস্মিত ভাবে অলক প্রশ্ন করলে,—"কি রকম?"

—"আর কি রকম! বন্দনার মামার অসুখের খবর পেয়ে, আজ সকালে দাদা বন্দনাকে নিয়ে চন্দননগর গেছেন। কাল বিকালের গাড়ীতে ফিরবেন।"

—"ও, তাই—"

—"সুধু তাই নয়,—বাড়ীতে কেউ নেই, আমাদের পাহারা দেবার ভার দাদা তোমার ওপর দিয়ে গেছেন। আজ রাত্রে তুমি এইখানে খাবে এবং থাকবে, বুঝলে?"

—"আচ্ছা, সে হবে'খন।...বৌদি' কোথায়?"

—"বৌদি' পাকশালায় ব্যস্ত আছেন। লক্ষ্মণ দেবরের আহার্য্য প্রস্তুতের ভার আজ তিনিই স্বয়ং নিয়েছেন।"

অঞ্চলের প্রান্তে মুখ ঢেকে সুরেশ্বরী হাস্য দমনের চেষ্টা করতে লাগলো।

তা'র কথা বলার ভঙ্গীতে ও হাস্য দর্শনে, অলকও সহাস্যে বল্লে,—"বটে! সহসা এ অধমের প্রতি তাঁ'র এরূপ করুণাযুক্ত স্নেহের কারণ? এমন অঘটন ত' পূর্ব্বে কখনো ঘটেছে বোলে মনে পড়ে না!"

সুরেশ্বরী হাস্যজড়িত চাপা কণ্ঠে তা'কে বল্লে,—"চুপ, চুপ.—এখুনি অঘটন ঘটন পটিয়সী আবির্ভূতা হ'য়ে পড়বেন।"

তা'র কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই ভিতর হ'তে মালতীর কণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়ে উঠল,—

—"মুখপোড়া, বাঁদর ছেলে, যত বারণ কচ্ছি তত আরো বাড়াচ্ছো। এখান থেকে দূর হ'য়ে যা বল্‌ছি ;—লাতীয়ে মুখ ভেঙ্গে দোব।"

সুরেশ্বরীর পানে তাকিয়ে অলক বল্লে,—"আহা! ছেলের প্রতি মায়ের কি গভীর স্নেহ!"

সুরেশ্বরী বল্লে,—"হ্যাঁ, অনুকরণ করবার মত।"

অলক হো হো কোরে হেসে উঠল। এমন সময় পলায়নরত পুত্রের পশ্চাৎধাবন-কারিণী মালতী উগ্রচণ্ডী মূর্ত্তিতে সেখানে এসে হাজির হ'ল মন্টু তখন সদর পার হ'য়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। তা'র গমন পথের দিকে তাকিয়ে মালতী চীৎকার কোরে উঠল,

—"কোন্ যমের বাড়ী যাবে,—কাঁড়া গেলবার সময় এসো, তোমাকে ভালো কোরে গেলাব অখন্।"

মালতীকে উদ্দেশ কোরে অলক বল্লে—"ব্যাপার কি বৌদি', হঠাৎ অত' রেগে গেলে কেন?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে, অলকের প্রতি একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে মালতী সেস্থান ত্যাগ করলো।

সুরেশ্বরী এবং অলক পরস্পরের পানে একবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে। পরে তা'রাও সেস্থান ত্যাগ কোরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করলে।

অলককে বসতে বোলে সুরেশ্বরী তা'র জন্য চা, জলখাবারের আয়োজন করতে অন্যত্র প্রস্থান করলে।...

* * * *

অনেকটা সময় চুপ চাপ ব'সে থেকে অলক অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠল।

ন্দনা অভাবে সারা বাড়ীখানা যেন আজ তা'র চক্ষে অরণ্যবৎ বোধ হ'তে লাগলো।

সারাদিনের ভেতর আজ একটি বারও সে বন্দনার দেখা পায়নি। সকাল হ'তেই সে ছায়ার বাড়ী গিয়েছিল, এবং সমস্ত দিনটা সেইখানেই আটকা পড়ে গিয়েছিল। ছায়া তা'কে ছাড়েনি। আরো বহুবার সে ছায়ার বাড়ী গেছে যদিও, তবে এবারের মত ফিরে এসে কোন'বার বন্দনার দর্শন বঞ্চিত সে হয়নি।...

বন্দনার উপর তা'র একটু রাগও হ'ল।...কেন, একান্তই যদি যাবার প্রয়োজন ছিল তা'র, তা'হলে তা'কে একটু জানিয়েও ত' সে যেতে পারত? না হয় খানিক দেরীই হ'ত! কি তা'কে জানিয়ে একখানা চিঠিও ত' সে লিখে রেখে যেতে পারত; যে, অলক! হঠাৎ মামার অসুখের খবর পেয়ে সেখানে যাচ্ছি, কাল ফিরব!

পরক্ষণে একটু হেসে আপন মনে সে বল্লে,—"বারে! কি স্বার্থপর আমি! সে তা'র মামার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে গেছে,—নিশ্চয়ই অসুখ খুব বেশী,—তাতেই হ'ল তা'র দোষ; আর আমি যে কতবার কারণে অকারণে তা'কে না বোলে এখানে সেখানে গেছি, কৈ তার বেলা ত' দোষ হয়নি! এই ত' আজকেই তা'কে না বোলে সব দিনটা ছায়ার বাড়ীতে কাটিয়ে এলুম।"...

সহসা মালতার আগমনে তা'র চিন্তা জাল ছিন্ন হ'য়ে গেল। এক বাটী চা এবং জলখাবারের থালাটা তা'র সামনে রেখে, মালতী হাস্যমুখে বল্লে,—"নাও ঠাকুরপো, খেয়ে নাও—চা জুড়িয়ে যাবে।"

এতদিন এবাড়ীতে অলক আসছে, কিন্তু এ হেন সৌভাগ্য তা'র

ইতিপূর্ব্বে কোনদিন' হয়নি ; তাই একটু আশ্চর্য্যই সে প্রথমটা হ'য়ে গেল। পরে মালতীর পানে তাকিয়ে সোৎসাহে সে বোলে উঠল, —"আরে ব্যাপার কি বৌদি'? ভাস্কর আজ দিকভ্রান্ত হ'লেন নাকি?"

অলকের কথার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করতে না পেরে মালতী একটু হাসল কেবল।

খাবারের থালাটা সরিয়ে রেখে, চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে অলক বল্লে,—"খাবার এখন খেতে পারব না বৌদি—ওটা সরিয়ে রাখ।"

মালতী বল্লে,—"তা' হবে না! আমি বলে, তোমার জন্য কষ্ট কোরে তোয়ের করলুম,—ও না খেলে আমি ছাড়ব না।"

"নস্থান তিল ভবং—পেটে আপাততঃ একটুকুও জায়গা নেই বৌদি,'... আচ্ছা এখন রাখ, রাত্রে খাবার সময় দিও।"

—"ঠিক ত' ?"

—"নিশ্চয়! তোমার রান্না আমি খাব' না!"

এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে অলকের পানে তাকিয়ে মালতী বল্লে,—"আজ ছায়ার বাড়ী গেছলে, সে বুঝি খুব খাইয়াছে?"

তা'র কণ্ঠের স্বর এবং নয়নের ভঙ্গী অলকের মোটে ভালো লাগলো না। সে একটু গম্ভীরভাবে বল্লে,—"তা, খাইয়েছে বৈই কি! সুধু পেটের খাওয়া সে দেয়নি, মনের খাওয়াও সে খাইয়েছে।"

হিংস্র চক্ষু দুটো মালতীর একবার জ্বলে উঠল। ক্রূর দৃষ্টিতে অলকের দিকে চেয়ে সে বল্লে,—"তা, সে ত' খাওয়াবেই ভাই, আমি কি আর তেমন খাওয়া খাওয়াতে পারব তোমায়!"

—"চেষ্টা করলেই পারবে।"

—"পারব ?" অলকের কথার অর্থ মালতী কি বুঝলে, সেই জানে ; সহসা তা'র মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। সে অলকের একান্ত কাছে এগিয়ে এসে বল্লে,—"সত্যি আমি পারব ?"

—"কেন পারবে না—না পারার কি আছে। মন দিলেই মন পাওয়া যায়।"

মালতী কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় সুরেশ্বরী প্রবেশ করায় তা'র আর বলা হ'ল না। কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে সে বল্লে,

—"একটা গান শোনাবে ঠাকুরপো ?"

—"বলো কি বৌদি,' তুমি গান শুন্‌বে ?"

—"কেন,বৌদি' কি মানুষ নয় ?"...সুরেশ্বরী বল্লে।

—"না, মানুষ ঠিক নয়, তবে মেয়েমানুষ। মানুষের আগে 'মেয়ে' কথাটা যোগ কোরে দিতে হবে !"......অলকের কথায় সকলেই হেসে উঠল।

অলক বল্লে,—"আমি জানতুম বৌদি' সঙ্গীত বিদ্বেষী—"

তা'কে বাধা দিয়ে সুরেশ্বরী বল্লে,—"মোটেই না ! এ ধারণা তোমার ভ্রান্ত। বৌদি' গান ভালবাসে, তবে বন্দনার মত চীল চেঁচান কণ্ঠ পছন্দ করে না। তোমার গান বৌদি'র ভালই লাগে ; কেমন না বৌদি' ?"

সুরসিকা সুরেশ্বরীর বিদ্রূপমিশ্রিত কথা মালতী বুঝতে না পারলেও অলকের বুঝতে আটকাল না। সে হাসতে হাসতে বল্লে,

—"যাক্ ! বৌদি' যখন শুনতে চেয়েছে, তখন একটা গাওয়াই যাক্।"

অলক হার্ম্মোনিয়ামটা সাম্‌নে টেনে নিয়ে বসল।—

(৯)

মালতীর সহসা এরূপ পরিবর্ত্তনের কোন হেতুই সুরেশ্বরী বা অলক কেউই বুঝতে পারলে না। তা'র অসাক্ষাতে উভয়ে বহু আলোচনা কোরেও কিছু স্থির করতে পারলে না।

অলকের প্রতি এতখানি দরদী যে মালতী কোনদিন হ'তে পারে, এ সম্ভাবনা কারো মনে কখনো স্থানলাভ করেনি। সুরেশ্বরী অলককে প্রশ্ন করলে,—"আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলে অলক?"

চিন্তার ভাণ কোরে অলক বল্লে,—"সেইটাই ত' ঠিক করতে পারছি না কিছুতে।"...

বাস্তবিকই মালতী আজ অত্যন্ত দুর্বোধ্য হ'য়ে উঠেছে। তা'র অস্বাভাবিক বড় বড় চক্ষু দুটো যেন কিসের আশায় অত্যধিক উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। তা'র মুখে চোখে একটা উন্মাদনা ফুটে বেরুচ্ছে।

অলকের কথার মধ্যে কোন্ অসম্ভব সম্ভাবনা প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে, কে জানে; যার জন্য মালতীর এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন সম্ভব হ'য়েছে!

অলকের সাথে এমন প্রাণ খুলে আলাপন মালতীর জীবনে এই প্রথম! অলকের সান্নিধ্য সে যেন আজ কোনমতে ছাড়তে পারছে না!......

আহারাদির শেষে অলক, মালতী এবং সুরেশ্বরী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প কোরে কাটালে। তারপর রাত্রি অধিক হওয়ায় যে যা'র কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়ল।...

মালতীর আরো কিছুক্ষণ থাকবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অলকের অত্যন্ত নিদ্রা বোধ হ'তে সে আর বসতে পারলে না। তবুও একবার মালতী আর একটু তাঁকে বসতে অনুরোধ কোরেছিল। অলক তা'র অনুরোধের উত্তরে বলে,—"মাফ্ কর বৌদি'! আর এক মিনিটও বস্‌তে পারব না,—ভীষণ ঘুম পেয়েছে।"...কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠে পড়ে।

*   *   *   *

...রাত্রি গভীর। গৃহের সকলেই হয়ত' এখন গাঢ় ঘুমে অচেতন। অলকও তা'র নির্দিষ্ট কক্ষখানির মাঝে অকাতরে ঘুমাচ্ছিল। সহসা একটা প্রচণ্ড শব্দে তা'র ঘুম ভেঙ্গে গেল। যেন মনে হ'ল তা'রই কক্ষ মধ্যে শব্দটা হ'ল। প্রথমটা সে কিছুই অনুমান করতে পারলে না। অজ্ঞাতেই তা'র কণ্ঠ হ'তে উচ্চারিত হ'ল,—"কে?"

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অন্ধকার ঘর কিছুই দেখা যায় না। তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষুদুটি ভাল কোরে মুছে নিয়ে সে আবার জিজ্ঞাসা করলে,

—"কে? ঘরে কে?"

—"আমি—"...ভীত কম্পিত চাপা কণ্ঠে ক্ষীণস্বর ধ্বনিত হ'ল।

—"আমি!—আমি কে?"......কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই অলক শয্যা ত্যাগ কোরে দেয়াল গাত্রের ইলেক্‌ট্রিক-লাইটের সুইচটা টিপে দিলে।

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে যে দৃশ্য অলকের চক্ষে ফুটে উঠল তা' কল্পনা করা যায় না। এ দৃশ্য দেখবার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। বিস্ময়ে তা'র কণ্ঠ রোধ হ'য়ে গেল।

সে দেখলে ঘরের মধ্যস্থলে মালতী দাঁড়িয়ে! প্রবল উত্তেজনায় তা'র সারাদেহ ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপছে। কক্ষে প্রবেশ-কালীন কিছুতে আঘাত লেগে নিশ্চয়ই সে খুব পড়ে গিয়েছিল; যার ফলে কপালের খানিকটা তা'র দারুণ ভাবে ফুলে উঠেছে।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে অলক তা'কে প্রশ্ন করলে,—"একি! বৌদি" তুমি এত রাতে?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মালতী বল্লে,—"ঠাকুরপো! আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি!"

ধৃত হাতখানা মুক্ত কোরে নিয়ে বেশ সহজ ভাবে অলক বল্লে, —"ভালবাসো সে ত' ভাল কথা বৌদি'; কিন্তু ভালবাসা জানাবার এই কি প্রকৃষ্ট সময়? লোকে দেখ্‌লে কি বলবে?"

—"বলুক—বলুক, লোকে যা' ইচ্ছে,—আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না! আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না ঠাকুরপো!—তুমি না হ'লে আমি বাঁচব না।"...পুনরায় সে অলকের দুটি হাত সজোরে চেপে ধরলে।

স্তম্ভিত অলক কিছুক্ষণ কোন কথা বল্‌তে পারলে না। মালতীর এইরূপ আশাতীত ব্যবহারে সে হতবাক্ হ'য়ে গেল।—বিস্ময়াকুল নয়ন দুটি মালতীর মুখের 'পরে স্থাপন কোরে সে তা'র লজ্জাহীন কদর্য্য উক্তিটা চিন্তা করতে লাগলো। পরে এক সময় নিজের বিস্মিত চিত্তটাকে সংযত কোরে নিয়ে সে কঠিন কণ্ঠে বল্লে,

—"বৌদি'! তুমি না [redacted] কুলবধূ! ছিঃ—! তুমি যে এতখানি নীচ তা' আমি জানতুম না। তোমাকে আমি

বৌদি' বলি—তুমি আমার মাতৃস্থানীয়া—তোমার কাছে এমন আশা আমি কোনদিন করিনি! আর এটুকু আজ থেকে তুমি জেনে রাখ বৌদি'—আমার চরিত্রে অন্য যত কিছু দোষই থাক, আমি লম্পট নই। তুমি এখুনি এ ঘর থেকে চ'লে যাও। আর ভবিষ্যতে এ রকম অবস্থায় যেন কখনো তোমায় আমার সামনে না দেখি। যাও, চ'লে যাও.. নইলে এখুনি স্থরোদি'কে ডাকব।"

মালতীর চক্ষের মধ্যে যেন একটা শয়তানীর দৃষ্টি জ্বলে উঠল। অলকের মুখের 'পরে জ্বলন্ত দৃষ্টিটা স্থাপন কোরে সে বল্লে,

—"বটে! বন্দনা আর ছায়ার বেলায় বুঝি এ কথাগুলো মনে থাকে না,—তাদের সর্ব্বনাশ করাটা বুঝি লম্পটতা নয়? মা' বোলে একটা ঐটুকু মেয়েকে সর্ব্বনাশের পথে টেনে—"

—"চুপ কর বৌদি'! মুখ সাম্‌লে কথা বলো। তুমি না ছেলের মা'? মা' ছেলের সম্বন্ধকে অত হীন প্রতিপন্ন করতে তোমার জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে না? বন্দনা, ছায়ার পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে তোমায় লজ্জা করে না?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ,—আমার ত' লজ্জা করবেই। তোমার লজ্জা করে না, একটা বিধবা অভিভাবক-হীনা মেয়ের গলা জড়িয়ে সারাদিনটা কাটাতে?—"

অলক চীৎকার কোরে উঠল,—"তুমি এক্ষুণি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও বলছি;—যাও—যাও—"

ঠিক সেই সময় নীচের তলার স্থরেশ্বরীর কণ্ঠ শোনা গেল,

—"কি হ'য়েছে অলক? অত চেঁচাচ্ছ কেন?"—

সুরেশ্বরীর কথা কানে যেতেই মালতী চমকে উঠল। তা'র মুখে আর কোন কথা বার হ'ল না। একবার কটমট্ চোখে অলকের পানে তাকিয়ে সে ঘর হ'তে এক প্রকার ছুটেই পালাল।—

মালতী চ'লে যাবার পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অলক একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সে ভাবতে লাগল, কি অদ্ভুত চরিত্রের নারী এই মালতী!—কি কুৎসিত মনোবৃত্তি! একটা দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে পর্য্যন্ত ও সন্দেহ করতে ছাড়ে না!

অলক ভাবলে—এই জন্যই তাহ'লে আজ সে অতখানি যত্ন মালতীর কাছে পেয়েছে! কে জানত, তা'র মনে এত আছে! ওঃ, কি অভিনয়ই ও করতে পারে!—

অলকের চিন্তা স্রোত হয়ত' আরো অনেক দূর তা'কে টেনে নিয়ে যেত, কিন্তু পথিমধ্যে সে চিন্তা বাধা পেল একটি কোমল স্পর্শে।—

"কে?"...বোলে চকিতে পিছন ফিরে তাকাতেই অলক দেখলে তা'র পার্শ্বে সুরেশ্বরী দাঁড়িয়ে।

তা'র পানে তাকিয়ে স্নেহপূর্ণ মৃদু কণ্ঠে সুরেশ্বরী ডাকল,

—"অলক!"

—"দিদি!"—

—"এ কথা যেন কারো কাছে প্রকাশ কোরো না ভাই!"

খানিকক্ষণ সুরেশ্বরীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে অলক বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে,

—"দিদি! বন্দনা ও ছায়াকে বৌদি' সন্দেহ করে যে, আমি নাকি তাদের খারাপ কোরে দিয়েছি!"

—"সে কি তুমি আজকে জানলে ভাই,—আমি ও অনেকদিন জানি। যে চোর হয় সে সকলকেই চোর ভাবে। নরকের মত কলুষিত যা'র মন সে কি কখনো স্বর্গ কল্পনা করতে পারে? তা'র চোখে সবই নরক। কিন্তু গঙ্গায় মড়া ভেসে গেলেই ত' আর গঙ্গা অপবিত্র হ'য়ে যায় না—গঙ্গা গঙ্গাই থাকে। ও নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই ভাই, শুধু মাথা গরম করা, তুমি শুয়ে পড়। রাত্তির জাগলে শরীর খারাপ হবে। রাতও আর বেশী নেই!—শুয়ে পড়।"....অলককে একরূপ ঠেলেই শয্যার উপর ফেলে দিয়ে সুরেশ্বরী আস্তে আস্তে ঘর হ'তে বার হ'য়ে গেল ···

তারপর অলকের আর নিদ্রার নাম গন্ধ এলো না। সারারাত নানা চিন্তায় বিনিদ্র অবস্থায় যাপন কোরে প্রভাত হ'তেই সে উঠে নিজের বাসায় চ'লে গেল।

ঐ ঘটনার পর এক সপ্তাহ অতিবাহিত হ'ল। এর মধ্যে অলক আর আসেনি।···বেণীবাবু, বন্দনা যথা সময়েই প্রত্যাবর্ত্তণ করেন। অলকের কথা জিজ্ঞাসা করায় কারো কাছেই তাঁ'রা কোন সন্তোষজনক উত্তর পাননি। বাসায় সন্ধান কোরেও তা'কে পাওয়া যায়নি—সে বাসাতেও নেই। কোথায় গেছে তাও কেউ বলতে পারে না।

সুরেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে,—"তাত জানিনা। সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই সেই ত' সে গেছে, তারপর আর ত' আসেনি।"—

তবে মনে মনে সে অনুমান কোরে নিয়েছিল যে, মনের চঞ্চল অবস্থাটা দূর করবার জন্য নিশ্চয় সে দুদিন কোথাও গিয়ে থাকবে।

দোষার কিন্তু কোন চিন্তাই নেই, সে বেশ নির্ব্বিকার। সে জানে তা'র সেদিনের দুষ্কৃতি কারো চক্ষেই ধরা পড়েনি। একমাত্র অলক ছাড়া সে কথা আর কেউ জানে না। সুরেশ্বরী যে সকল কথাই জানে সে ধারনা তা'র নেই। এখন অলক যতদিন না আসে ততদিনই তা'র পক্ষে মঙ্গল। কেন না অলক এসে যদি ঐ সকল ঘটনা প্রকাশ কোরে দেয় তাহ'লে তা'র নির্যাতনের আর অবধি থাকবে না। তবে সম্ভবতঃ অলক সে কথা প্রকাশ করবে না—করলে এতদিন করত' !

···সেদিন বৈকালে সুরেশ্বরী নিবিষ্ট-চিত্তে কি একটা কাজ করছে, এমন সময় বন্দনা এসে ডাক্‌ল,

—"পিসীমা !"

—"কি মা ?"

—"অলকের কি হ'য়েছে পিসীমা ? সে আর আসে না কেন ?"

—"তা ত' জানি না মা ! নিশ্চয় কোন কাজে কোথায় গেছে এলেই আবার আসবে।"

—"আমি তা'কে না বোলে মামার বাড়ী গেছ্‌লুম বোলে বোধহয় সে রাগ কোরেছে, না পিসীমা ?"

—"না, না, রাগ করবে কেন ?···দেখ্‌ না, ঝুপ্‌ কোরে কখন এসে পড়বে। দাদা ত' কাল তা'র বাসায় গিয়েছিল, কি হ'ল ?···চাকরটা কিছু বলতে পারলে না ?"

—"না, বাবা ত' কাল যাননি. আজ সন্ধ্যের পর বোধহয় যাবেন। ···আমিও বাবার সঙ্গে যাব। আচ্ছা পিসীমা, কদিন ধরে মায়ের কি হ'য়েছে বলত' ? একটা কথা বলতে গেলে যেন মারতে আসছে।"

সুরেশ্বরী বন্দনার মুখের পানে চেয়ে একটু হাসলে, কিছু বল্‌লে না।

বন্দনা বল্লে,—"ছায়াপিসী অনেক দিন আসেনি, আজ অলকের বাসা থেকে ফেরবার সময় তা'কেও একবার দেখে আসব। আর যদি সুবিধে হয় সঙ্গে কোরে নিয়ে আসব। পূজো ত' এসে গেল, পূজোর কটা দিন এখানে না হয় থেকেই যাবে, কি বল' পিসীমা ?"

—"সে ত' ভাল কথাই মা !"

বাস্তবিকই এবার ছায়া অনেক দিন আসেনি। তার কোন খবরও পাওয়া যায়নি।

বন্দনার কথায় সুরেশ্বরী ভাবলে,—আচ্ছা, অলক ছায়ার কাছে নেই ত' ? হ'তেও পারে !—হয়ত' ছায়ার কাছে গিয়ে সব কথা বলায় সে

তাঁকে আটকে রেখেছে—আসতে দেয়নি। কিন্তু তাঁকে আটকে রাখা ত' সহজ কথা নয়। বন্দনাকে ছেড়ে সে ত' এতদিনও বড় একটা কোথায়ও থাকেনি।..তবে কি সত্যই তা'র কোন বিপদ হ'ল! বেণীবাবুর উপর তা'র রাগ হ'ল;—এতদিনেও কি অলকের একটা খোঁজ করা তাঁ'র উচিৎ ছিল না? আজ এক হপ্তা বাদে দরদ দেখিয়ে খুঁজতে যাওয়া হ'চ্ছে।

আবার ভাবে, তাঁ'রই বা দোষ কি—কাজের জ্বালায় একটু কি তাঁ'র হাঁপ ছাড়বার উপায় আছে। তবুও ত' মাঝে একবার খোঁজ কোরেছিলেন।...

যাই হোক! সেদিন সন্ধ্যার পরে বন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে বেণীবাবু অলকের সন্ধানে তা'র বাসা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁদের যাওয়াই সুধু সার হ'ল, অলকের তেমন কোন খবর জানতে পারলেন না।

বাসায় একটি বৃদ্ধা রাঁধুনী এবং একটি নব নিয়োজিত উড়িয়া ভৃত্য ছাড়া তেমন আর কেউ অলকের ছিল না—যা'র কাছ হ'তে তা'র খবর পাওয়া যেতে পারে।

বেণীবাবু যখন কন্যাসহ তা'র বাসায় পৌঁছালেন, তখন অন্ধকার রাঁধুনীটিও বাসায় ছিল না। ভৃত্য বনমালী সুধু একাই ছিল। বেণীবাবু তাঁকে অলকের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে যে কি বল্লে তার কিছুই তাঁ'দের বোধগম্য হ'ল না।

বেণীবাবু তা'কে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"তোর বাবু কোথা?"

বনমালী ক্যাল ক্যাল কোরে তাঁ'র মুখের পানে তাকিয়ে অবোধ্য ভাষায় বল্লে,—"বাবু নাই—কৌঠি যাইছন্তি মু কই পারিবিনি।"

বেণীবাবু বল্লেন,—"কি হ'য়েছে ? 'কৌঠি যাইছন্তি' ? সে আব'র কি ?"

বনমালী বল্লে,—"মু কেমিতী জানিবি কৌঠিকি যাইছন্তি ?"

বেণীবাবু একটুক্ষণ চুপ কোরে থেকে তা'র কথা বোঝবার চেষ্টা করলেন। পরে বল্লেন,—"কি বল্‌লে, কৌঠিকি ? কৈ বাবা এতখানি বয়েস হ'ল কৌঠিকি বোলে যে কোন জায়গা আছে কখনো ত' শুনিনি। কৌঠিকি সে কোন্ পরগণা ? ..একটু ভাল কোরে বল্ বাবা, তোর কথা কিছু বুঝতে পারি না। "কৌঠিকি যাইছন্তি' কি—কোন্ দেশ সে ?"

অবাক্ হ'য়ে বোকার মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বনমালী বল্লে,

—"দেশ কন্ ম'...?"

রুক্ষস্বরে বেণীবাবু বল্লেন,—"আচ্ছা মুস্কিলে ত' পড়্‌লুম দেখ্‌ছি !" ...তা'র মুখের কাছে হাতটা নেড়ে তিনি বল্লেন,—"আরে তোর বাবু কোথায় ?"

—"কইলি পারা কৌঠি যাইছন্তি—"

—"আবার কৌঠি, কৌঠি। এ ত' আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়্‌লুম. —একটা কথা বোঝাবার যো নেই !"...পুনরায় তিনি তা'কে জিজ্ঞাসা করলেন.—"বলি, তোর বাবু কি এখানে নেই ?"

—"কইলি পারা নাই বলিকিরি।"

—"দূাৎ তোর কিরি কিরির কাঁথায় আগুণ !—ওরে বাবা, একটু বাংলা কোরেই বল্‌না ছাই—তোর বাবু কোথায় গেছে জানিস্ ?"

বনমালী মাত্র দুই মাস হ'ল কলিকাতায় পদার্পণ কোরেছে, এখনো

সে বাংলা ভাল বুঝতে পারে না, আর বল্‌তে ত' একেবারেই পারে না। তবে বেণীবাবু যে তা'র বাবুর সন্ধানেই এসেছেন এটা সে বেশ বুঝেছিল, এবং বুঝে সে তা'র বাবুর অনুপস্থিতিটা তাঁ'কে খালি বোঝাবার চেষ্টা ক'রছিল।...বেণীবাবুর জিজ্ঞাস্য হ'চ্ছে, অলক কোথায় গেছে এবং কবে ফিরবে? কিন্তু বনমালীর তা' জানা না থাকায় সে শুধু বাবু নেই সেই কথাটাই তাঁ'কে বারে বারে বলছিল। শেষে যখন কোনমতেই সে তা'র বক্তব্যটা তাঁ'কে বুঝিয়ে উঠতে পারলে না, তখন অতি কষ্টে তা'র বক্তব্য বিষয়টা বাংলা কোরে বলবার চেষ্টা করলে। এক অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি কোরে সে বল্‌লে,—

"বাবু নাহি। কুথা যাইছন্তি আমোর জানা ন আছে।"

এতক্ষণে তা'র কথাটা বেণীবাবুর হৃদয়ঙ্গম হ'ল। তিনি বল্লেন,—

—"তাহ'লে তোমার বাবু নেই? কোথা গেচে তাও জান না?"

বনমালী বল্লে,—"হাউ—"

...উভয়ের ঐরূপ কথাবার্ত্তা এবং ভাব-ভঙ্গী দেখে শুনে বন্দনা এতক্ষণ সেইখানে হেসে লুটাচ্ছিল।...

অলক যে গৃহে নাই. এবং কোথায় গেছে তাও কেউ জানে না। সেই কথাটা জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা কোরে এইবার বেণী বাবু ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পেরে বন্দনাকে বল্লেন,—"চল যাই—অলকের খবর এরা জানে না।"

তাঁ'র কথায় বন্দনার হাসির মাত্রা আরো বেড়ে গেল। সে হাসতে হাসতে বল্লে,—"বাবা, ওর সঙ্গে আরো একটু কথা বল' না!"...বোলেই সে খিল খিল কোরে হেসে উঠল।

কন্যার অবস্থা দেখে বেণীবাবুও তা'র পানে তাকিয়ে হেসে ফেল্লেন। বল্লেন,—"আবার কথা? রক্ষে কর মা,—যা চাকর ভায়া রেখেছে—ব্যাটার একটা কথা কি বুঝতে পারি ছাই! কিড়ি মিড়ির চোটে প্রাণ যায় আর কি!"

রাস্তায় বেরিয়ে বন্দনা বেণীবাবুকে ছায়ার বাড়ী যাবার কথা বলায়, তিনি অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বল্লেন,—"ঠিক বোলেছিস্; ছায়ার কাছে হয়ত' অলকের খবর পাওয়া যেতে পারে!"

পিতা পুত্রীতে তখন মাণিকতলায় ছায়ার বাড়ী যাওয়াই স্থির কোরে, সেইদিকে চল্লেন।

কিন্তু সেখানে গিয়েও বিশেষ কোন' ফল হ'ল না; কারণ যা'র কাছে তাঁ'রা গেলেন, সেই ছায়াকেই তাঁ'রা গৃহে দেখতে পেলেন না। শুনলেন যে কাশীতে তা'র কে এক দিদিশাশুড়ী আছেন, তাঁ'র অসুখের সংবাদ পেয়ে সে তাঁ'কে দেখতে গেছে। কার সঙ্গে গেছে জিজ্ঞাসা করায় একজন দাসী বল্লে—"কেন, আপনি জানেন না? আপনার ভায়ের সঙ্গেই ত' মা গেছেন।"

—"কার সঙ্গে? অলকের সঙ্গে? ও—তাই বল!"...একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বেণীবাবু বল্লেন,—"যাক্ বাবা বাঁচা গেল! ভায়া আমার তাহ'লে ছায়া সহ কাশী যাত্রা কোরেছেন? দেখলে, আমি ত' বোলেই-ছিলুম—নিশ্চয় সে ছায়ার কাছে আছে! যাই হোক্! এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।"

অলকের অদর্শনের প্রকৃত হেতুটি অবগত হ'য়ে এবার তাঁ'রা নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরলেন।

বেণাবাবু অলকের কাশী যাত্রার সংবাদে অনেকটা আরাম বোধ করলেন, এবং আনন্দের সঙ্গেই গৃহে প্রত্যাগমন করলেন। তিনি ভাবলেন, যাক্, ছেলেটার যে কোন' বিপদ আপদ হয়নি এইটুকুই যথেষ্ট!

বন্দনা কিন্তু ও সংবাদে মোটেই আনন্দলাভ করতে পারলে না। সে একটা অব্যক্ত বেদনাযুক্ত অভিমান নিয়েই গৃহে ফিরল। তা'কে না জানিয়ে ছায়ার সঙ্গে অলক কাশী গেছে এ কথাটা চিন্তা করতেই যেন সে বুকের মধ্যে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করতে লাগলো। সে ভাবলে, অলককে না জানিয়ে সে মামার বাড়ী গিয়েছিল বোলে কি, তার শাস্তি অলক এই ভাবে তা'কে দিলে? তা'র চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে এলো।

বাড়ী ফিরেই সে আপন ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ কোরে, শয্যার উপর লুটিয়ে পড়ল। তা'র চোখের জলে উপাধান সিক্ত হ'তে লাগল।... অলক তা'হলে ছায়াকেই বেশী ভালবাসে! তা যদি না হবে তা'হলে কি এতদিন—

সে আর ভাবতে পারলে না। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

—"বন্দনা!"...সুরেশ্বরীর কণ্ঠ!

বন্দনা চম্‌কে উঠল। ত্রস্তে জল ভরা চক্ষু দুটি মুছে নিয়ে সে ধরা গলায় বল্লে,—"কি বলছ পিসীমা?"

সুরেশ্বরী তা'র পার্শ্বে ব'সে তা'র মাথাটি আপন বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লে,—"ছেলের জন্যে বুঝি মন কেমন করছে রে ?"

—"মন কেমন করবে কেন ?—পিসীমা যেন কি ! আমার অমন যা'র তা'র জন্যে মন কেমন করে না। তা'র যেখানে খুসী যাক্ না, আমার তাতে কি ? তা'র কি আমার জন্যে মন কেমন করে যে আমার করবে ?—সে কি আমাকে ভাল—?"

সে আর বলতে পারলে না, অশ্রুতে তা'র কণ্ঠ সহসা রোধ হ'য়ে গেল।

সুরেশ্বরী তা'র কুঞ্চিত কেশগুলির মধ্যে অঙ্গুলী চালনা করতে করতে স্নেহ-মিশ্রিত স্বরে বল্লে,—"পাগলী ! কে বল্লে সে তোকে ভালবাসে না ? সে তোকে যা ভালবাসে তা' কি কেউ কল্পনা করতে পারে !—তা'র ভালবাসার তুলনা হয় না।"

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বন্দনা বল্লে,—"হ্যাঁ, ভালবাসে না কচু !.. আমি আর তা'র মা হ'ব না—কক্ষনো না !"

সুরেশ্বরী বল্লে,—"চুপ, চুপ, মা হবো না ও-কথা বলতে নেই। মেয়ে মানুষের জন্মই যে মা হবার জন্যে রে পাগলী।"

—"তা হোক্, আমি আর ওর মা হবো না। আমি এইটুকু মেয়ে অত বড়ো বুড়ো ছেলের কি জন্যে মা হ'তে যাব ? আমি কারো মা হ'তে চাই না।

স্মিত হাস্যে সুরেশ্বরী বল্লে,—"তা কি কখনো হয় রে—মায়ের জাত হ'য়ে মা হব না বল্লে চলবে কেন ? পৃথিবী যে তা'হলে লয় হ'য়ে যাবে।"

—"ও কি আমার সত্যিকার ছেলে !"

—"মাতৃজাতির কাছে সত্যি মিথ্যে বোলে ত' কিছু নেই মা। পৃথিবী সুদ্ধই তাদের ছেলে। জন্মের দিন থেকেই আমাদের বুকে মাতৃত্ব বিকাশ পায়, তার পর' বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমরা সেটা উপলব্ধি করি, তখন সেই মাতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করে। আমরা অন্তরের দরদ দিয়ে জগতের সকল ছেলের দুঃখ্যু ভুলিয়ে দোব, সকলকে সমান ভাবে বুকে টেনে নেব, তবে ত' আমাদের প্রকৃত শান্তি মিলবে। কে ছেলে, কে বুড়ো, কে পর, কে আপন এ বিচার করতে গেলে মা' হওয়া চলবে না। মা চিরকাল মা!' এত লেখাপড়া করো এটুকু জান না?... মায়ের কি কখনো ছেলের 'পরে অভিমান করা সাজে?"

বন্দনা তা'র বক্ষ হ'তে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে অবাক বিস্ময়ে বল্লে,

—"পৃথিবীতে কত ছেলে আছে তার কি সংখ্যা আছে! সকলের মা হওয়া বুঝি আবার যায়? তোমার এক কথা পিসীমা!"

সুরেশ্বরী তা'র কপোল-চুম্বন কোরে বল্লে,—"কেন যাবে না মা! এই দেখ না—অলক তোমাকে মা' বোলে তৃপ্তি পায়, তুমিও তা'কে ছেলের মত ভালবেসে আনন্দ পাও—তা'কে না দেখলে কষ্ট হয়—তা'র দুঃখে ব্যথা পাও! তেমনি এমন ভাবে নিজেকে তৈরী করো, যেন জগতের সব ছেলে তোমার মাতৃত্বের অমৃত লাভ কোরে একদিন অলকের মতই তৃপ্তি পায়। তুমিও তাদের মা হ'য়ে যেন সত্যিকারের স্নেহ সকলকে দিতে পার। দেখবে তাতে কত আনন্দ পাওয়া যায়।"

তা'কে বাধা দিয়ে বন্দনা বল্লে,—"তাহ'লে তুমি কেন হওনি পিসীমা? তোমার কাছে ত' কৈ কেউ মা বোলে আসে না। খালি করুণা আর হারুদাই ত' তোমায় মা বলে!"

—"আমি যে নিজেকে তৈরী করতে পারিনি মা! মায়ের উপযুক্ত হ'লে তবে ত' সবাই মা বলবে!"...

—"কি কোরে নিজেকে সে রকম তৈরী করতে পারা যায়?"

—"হিংসা, দ্বেষ, প্রথমে ছাড়তে হবে; তারপর সকলকে আপন ভেবে ভালবাসতে হবে। সকলের দুঃখ্য নিজের বুকে অনুভব করতে হবে, কাউকে ঘৃণা করলে চলবে না। নিজের ছেলেটির প্রতি আমাদের যেমন যত্ন থাকে, বিশ্বের সব ছেলেকে তেমনি কোরে স্নেহ যত্ন দিতে হ'বে। সুধু এই নয়, আরো অনেক কিছু আছে। নিজেকে তৈরী করতে হ'লে প্রচুর সাধনার দরকার।"

—"কি রকম সাধনা পিসীমা? বলো না,—আমার শুনতে বড় ভাল লাগে।"...বন্দনা ব্যগ্রতা সহকারে প্রশ্ন করলে।

তা'র পানে তাকিয়ে সুরেশ্বরী একটু হাসলে। হেসে বল্লে,—"সামান্য জ্ঞান নিয়ে সব কথা ত' তোমার বুঝিয়ে উঠতে পারব না মা। এ সব কথা তুমি অলককে জিগেস কোরো সে তোমায় ভাল কোরে বুঝিয়ে দেবে। আমিও তোমায় যা' বল্লুম, সবই অলকের কাছে শেখা।"

সুরেশ্বরীর কথার মধ্যে এতক্ষণ বন্দনা বেশ আনন্দই পাচ্ছিল। অলকের কথা এক প্রকার সে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু এইবার অলকের নাম হ'তেই তা'র ক্ষণপূর্ব্বের অভিমান আবার সজাগ হ'য়ে উঠল। সে একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল। অল্পক্ষণ পরে আপন মনে বল্লে,

—"ও তুমি যতই বলো, অলকের সঙ্গে আর আমি কথা বলবো না,—তা'র মা আমি হ'তে চাইনা। ছায়া তা'র মা হোক্।"...তা'র চোখের কোণে আবার দু' ফোঁটা অশ্রু টল টল কোরে উঠল।

সুরেশ্বরী তা'র ঐ ভাব বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য কোরে একটু হাসলে। হয়ত' তা'র প্রাণের কথা সে ধ'রে ফেল্‌লে। তাই তা'র পানে তাকিয়ে সে মনে মনে বল্লে,—অলককে শুধু ভালই বেসেছ বন্দনা, তাও হয়ত' তা'রই ভালবাসায় আকৃষ্ট হ'য়ে, কিন্তু তা'র মনের খবর জানার অবসর তুমি পাওনি—জীবনে পাবে কি না তাও সন্দেহ। তোমাকে সে যা' দিয়েচে তার এক কণাও ছায়াকে দিতে পারেনি আর পারবেও না।"

...প্রকাশ্যে বল্লে,—"অভিমান করিসনি বন্দনা,—অলকের ভালবাসা একটু বড় না হ'লে তুই বুঝতে পারবি না। তোকে সে যতখানি দিয়েচে ততখানি আর কাউকে কোনদিন দিতে পারবে না।"

বন্দনা কোন কথা বল্‌লে না। সে নীরবে পূর্ব্ববৎ বসে বসে নিজের আঙ্গুলগু'লি নাড়াচাড়া করতে লাগলো!

—"বন্দনা—ও বন্দনা!"...ডাকের সঙ্গে সঙ্গে বেণীবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাদের উভয়কে ঐ অবস্থায় দেখে তিনি বল্লেন;

—"ব্যাপার কি? পিসী ভাইঝীতে কি অত পরামর্শ হ'চ্ছে?"

সুরেশ্বরী এক গাল হেসে বল্লে,—"পরামর্শ খুব গভীর দাদা..."

—"সে ত' দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের পরামর্শের চোটে যে এ বুড়োটার ক্ষিদের নাড়ী পাক্ দিচ্ছে। তোমাদের যে রকম অবস্থা দেখ্‌চি তাতে আজ উঠবে বোলেও ত' মনে হয় না।"

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সুরেশ্বরী বল্লে,

—"হ্যাঁ, অনেক রাত্তির হ'য়ে গেছে! চল্ বন্দনা—"

তিন জনেই আর বিলম্ব না কোরে কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন।

(১২)

আজ শারদীয়া পঞ্চমী...

বাংলার ঘরে ঘরে একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। প্রাণে প্রাণে নূতন উৎসাহ—নূতন আশা!

দুর্ভাগা বাঙালী জাতির নিরানন্দ পূর্ণ জীবনের মাঝে বৎসরের এই কটা দিনই মাত্র আনন্দের একটু রেখাপাত করে। ধনী নির্ধনী নির্বিশেষে সকলেই এ আনন্দের অধিকারী। এই নাস্তিকতার যুগেও বাঙালীর প্রাণ এই কটি দিন ভক্তিরসে আজো আপ্লুত হ'য়ে ওঠে। আজো বাঙালী সারাবৎসর আকুল আগ্রহে এই কয়দিনের আশায় অপেক্ষা কোরে থাকে। বোধনের সুরে সুরে আজো বাঙালীর প্রাণে প্রাণে পুলক হিল্লোল ব'য়ে যায়। দৈন্য নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট জাতি যেন শান্তিময়ী জননীর নির্বিশঙ্ক অঙ্কে আশ্রয় লাভ কোরে বৎসরের এই কয়দিন প্রকৃত শান্তিই পেয়ে থাকে।...

জননীর আগমন সংবাদে এই সময় প্রকৃতিও যেন অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিতা হ'য়ে উঠে। প্রকৃতির এই সময়কার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমুগ্ধচিত্তে কবি লিখে গেছেন,—

"আজি কী তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।..."

গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে একটা আনন্দপূর্ণ জাগরণের সাড়া—উৎসবের আয়োজন। ধনীর গৃহে গৃহে চলেছে প্রতিমার পূজা-আয়োজন। সামর্থহীন দরিদ্রের ঘরে পূজার কোন' উদ্যোগ নেই বটে, তবে অন্তরে আছে আবাহন গীতি—মনে পুলক শিহরণ।

…বেণীবাবুর গৃহেও পূজার আয়োজন চ'লেছে। প্রতি বৎসরই তাঁ'র গৃহে জননীর আগমন হয়। অবস্থা খারাপ হ'লেও বহুদিনের এ পূজা তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। অবশ্য প্রতি বৎসরই মনে মনে ভাবেন যে, এ বছর আর পূজা কোরে উঠতে পারবেন না; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত তাঁ'কে কোরেই উঠতে হয়। সেটা তাঁ'র মনের দুর্ব্বলতাব জন্যই হোক্ বা যে কারণেই হোক্। তবে পূর্ব্বকার মত সেরূপ সমারোহ আর তিনি করতে পারেন না।

প্রত্যেকবার পূজার সময় ছায়া বেণীবাবুর বাড়ী আসে এবং পূজার কয়দিন এইখানেই থাকে। এবারও এর অন্যথা হয়নি; ঠিক সময় মতই এসে উপস্থিত হ'য়েছে।

ছায়া এবং অলক মাত্র কয়দিন পূর্ব্বে কাশী হ'তে প্রত্যাগমন কোরেছে।

বন্দনা ভেবেছিল অলক ফিরলে সে তা'র সাথে কথাই বলবে না। কিন্তু তা'কে দেখে ও সহসা কাশী যাত্রার কারণ অবগত হ'য়ে তা'র সমস্ত রাগ বা অভিমান নিমিষে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

অলক কাশী হ'তে ফিরে প্রথমেই বন্দনার সঙ্গে দেখা করতে আসে; এসেই সে সুরেশ্বরীর নিকটে শোনে যে, তা'র প্রতি বন্দনা ভীষণ অভিমান কোরেছে—তা'কে না জানিয়ে হঠাৎ সে কাশী গিয়েছিল বোলে।

অলকও এটা পূর্ব্বেই কল্পনা কোরেছিল, তাই সে অদূরে দণ্ডায়মানা বন্দনার নম্র আরক্ত মুখের পানে তাকিয়ে একটু হাসলে। হেসে বল্লে,

—"কি করবো মা···সেদিন তোমাদের বাড়ী থেকে সকালে বেরিয়েই যেমন বাসায় পা' দিয়েছি অমনি ছায়ার কাছ থেকে ডাক এলো! তারপর সেখানে গিয়েই বাঁধল বিভ্রাট! শুনলুম কাশীতে ছায়ার এক বৃদ্ধা দিদিশ্বাশুড়ী আছেন তাঁ'র ভীষণ ব্যায়রাম—টেলিগ্রাম এসেছে ছায়াকে যেতে হ'বে। অথচ তা'কে নিয়ে যাবার লোক নেই—সরকার মশা'য়ের অসুখ—খাজাঞ্চী দেশে গেছে। কাজেই সকল দিক দেখে ছায়া শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই পাকড়াও করলে। ওর কাকুতী মিনতি শুনে আমিও আর না বলতে পারলুম না। সেই রাতেই ওকে নিয়ে কাশী যেতে হ'ল। তোমাকে জানাবার আর সময় কোরে উঠতে পারিনি মা। তা' এতে যদি আমার কোন দোষ হ'য়ে থাকে, তুমি আমাকে—"

তা'র কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই বন্দনা ছুটে এসে তা'র মুখটা চেপে ধ'রে বল্লে,—"বারে! আমি বুঝি বোলেছি তোমার দোষ হ'য়েছে।"

অলক হো হো কোরে হেসে উঠল। সুরেশ্বরীর পানে তাকিয়ে বল্লে, —"দিদি! মায়ের রাগ জল!"...

সুরেশ্বরীও হাসতে হাসতে বল্লে,—"তাই ত' দেখছি। আর ছেলের ওপর রাগ কোরে কি মা থাকতে পারে।"—

তারপর হ'তে অলক এ কদিন বন্দনাদের বাড়িতেই আছে—বাসায় যাবার সময় কোরে উঠতে পারেনি। পূজার সমস্ত ভার বেণীবাবু এক

রকম অলকের উপরই চাপিয়ে দিয়েছেন। এ যেন অলকেরই পূজা। তা'র নিশ্বাস ফেল্‌বার পর্য্যন্ত সময় নেই।

আজ সকালে উঠেই অলক বেরিয়ে গিয়েছিল। যখন ফিরল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়। তা'র এইরূপ বিলম্বের জন্য বাড়ীর সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল। তা'কে দেখেই বন্দনা বোলে উঠল'—"খুব, খুব লোক! সেই সকাল বেলা বেরিয়ে, এখন ভর সন্ধ্যে বেলায় বাবুর ফেরা হ'ল। এতক্ষণ কি জমিদারীর কাজ করা হ'চ্ছিল শুনি?"

উপস্থিত সকলেই তা'র পাকামি কথায় হেসে উঠল। অলকও হাসতে হাসতে বল্লে,—"মা আমার সুধু শাসন করতেই জানে। ছেলেটার যে সারাদিন ঘুরে ঘুরে কত কষ্ট হ'য়েছে, সে দিকে মায়ের নজর নেই।"

বন্দনা একটু অপ্রস্তুতের স্বরে বল্লে—"তা যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!"

...সহসা তা'র দৃষ্টি পড়ল অলকের পিছনে দণ্ডায়মান মুটিয়াটির 'পরে। ব্যগ্রভাবে সে জিজ্ঞাসা করলে,—"ওর মাথায় ওসব কি অলক? কাপড়?"

অলক কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য সহকারে বল্লে,—"না, এই সব পাঁচ রকম বাজার-টাজার আছে—"

বন্দনা বল্লে,—"আহা,—জহরলাল পান্নালাল, কমলালয় এদের দোকানের মার্কা মারা মারা বাক্স কোরে উনি বাজার কোরে নিলে এলেন! এদের দোকানে বুঝি আজকাল পূজোর বাজার বিক্রী হ'চ্ছে?"

অলক ততক্ষণে মুটিয়ার মাথা হ'তে মোটটি নামিয়ে নিয়েছে। সে তা'র কথার উত্তরে বল্লে,—"তা হচ্ছে বৈ কি—না হ'লে আর আনলুম কি করে।"

বন্দনা তাড়াতাড়ি একটা বাক্স খুলে ফেলে উল্লসিত কণ্ঠে বোলে উঠল,

—"এই ত' এতে কাপড় রোয়েছে! আর কি না আমাকে বলা হ'চ্ছে বাজার!...কি সুন্দর কাপড়! এ কা'র অলক?"

—"যে নেবে তা'র।"

—"আহা, কথার ছিরি দেখ—"যে নেবে তা'র! বলোনা সত্যি কা'র?"

—"যে নেবে তা'র, বোলে অলকদা' যখন বলছে, তুই নিয়ে নেনা বন্দনা।"...বলতে বলতে ছায়া এসে বন্দনার পাশে বসে ত্রস্ত হস্তে অন্যান্য বাক্সগুলি খুলে ফেললে!

অলঙ্কার এবং বসন ব্যাপারে নারী মাত্রই একটু বেশী রকমের ঔৎসুক্য প্রকাশ কোরে থাকে। অলকের নীত এতগুলি মূল্যবান বসন ও পোষাক দর্শনে উপস্থিত সকল নারীই একটু আগ্রহান্বিতা হ'য়ে উঠল। বিস্মিত কণ্ঠে ছায়া প্রশ্ন করলে,—"সত্যি অলকদা', এত সব কাপড় চোপড় কাদের? এগুলো ত' দেখছি বেনারসী!...বাবা, এ বাক্সটায় আবার প্যাণ্ট কোট! এটায় কি দেখি......ধুতী আর এক জোড়া গরদের থান! বলো না অলকদা' এ সব কাদের?"

তা'র পানে তাকিয়ে মৃদু হাস্যে অলক বল্লে,—"বলো দিকি কাদের? দেখি তোমার বুদ্ধি কত..."

সুরেশ্বরী বল্লে,—"আমি বলতে পারি।"

অলক জিজ্ঞাসু নেত্রে তা'র পানে তাকালে। সে হাসতে হাসতে বল্লে,—"আমাদের .."

অলক হেসে উঠল। বন্দনা এবং ছায়া সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলে,—"আমাদের ? সত্যি ?"

অলক বল্লে,—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তোমাদের না হ'লে আমি আবার কা'র জন্যে আনতে যাব!"...সুরেশ্বরীকে উদ্দেশ কোরে সে বল্লে,—"দিদি আমার হ'য়ে কাপড় জামাগুলো তুমি যা'কে যা' মানায় ভাগ কোরে দাও ত'। আমি বাপু ওসব পারি না। ঐ চারখানা বেনারসী আছে, বৌদি'র, ছায়ার আর বন্দনার। তার মধ্যে ছোট যেখানা সেখানা করুণার। আর প্যাণ্ট কোট যা' আছে সে মণ্টুর ও হারুর। ওদিকের ধুতী পাঞ্জাবী দাদার। গরদের জোড়াটা তোমার—একখানা চাদর, একখানা থান, বুঝলে ?"

সুরেশ্বরী আর দ্বিরুক্তি না কোরে তৎক্ষণাৎ উৎসাহ সহকারে বণ্টন ব্যাপারে লেগে গেল।

ইতিমধ্যে সকলেই প্রায় সেখানে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। এমন কি বেণীবাবু পর্য্যন্ত। আসেনি কেবল মালতী। সে এক একবার আড় চোখে অলকের পানে তাকাচ্ছে আর মনে মনে সঙ্কল্প আঁটছে, কেমন কোরে সেদিনের সেই প্রত্যাখানের প্রতিশোধ নেওয়া যায়! সে ভাবলে, আজকে অলককে অপমান করবার একটা মস্ত সুযোগ তা'র হাতের কাছে এসে গেছে—এ সুযোগ সে ছাড়বে না।

বেণীবাবুর হাতে জামা এবং কাপড়খানা সুরেশ্বরী দিতেই তিনি সহাস্যে বল্লেন,—"নাঃ, অলক দেখছি আমায় ছোক্‌রা না সাজিয়ে ছাড়বে না।"

অলকও তাঁ'র হাস্যে যোগ দিয়ে বল্লে,—"কেন, পাঞ্জাবী গায়ে দিলেই

বুঝি ছোক্‌রা ব'নে যেতে হয় ?"...একটু থেমে সে বল্লে,—"তা ত' হ'ল —কিন্তু ছায়ার বিষয় বোধহয় একটা ভুল কোরে ফেলেছি !"

তা'র কথার মর্ম্ম বুঝতে পেরে সুরেশ্বরী বল্লে,—"না কিছু ভুল হয়নি —ছায়া এ সব পরে। ওর কি এখন সে বয়স হয়েছে--"

কথা শেষের সঙ্গে সুরেশ্বরী মালতীর জন্য আনীত কাপড়খানা নিয়ে তা'র কাছে উঠে গিয়ে বল্লে,—"বৌদি' এই নাও অলক তোমায় পূজোর কাপড় দিলে—"

মালতী ভ্রূভঙ্গী সহকারে বল্লে,—"কেন, আমি কি ভিকিরি না কি যে, যে সে আমাকে কাপড় পরতে দেবে, আর আমি তাই নোবো ?"

সুরেশ্বরী জিহ্বাগ্র দংশন কোরে বল্লে,—"ছি, ছি, ওকথা বলতে নেই বৌদি' ! অলক কি আমাদের পর ? আমোদ কোরে ও নিয়ে এলো— এ নিতে হয়, নাও..."

মালতীর কোলের 'পর সুরেশ্বরী কাপড়খানি রেখে দিলে !

কঠিন কণ্ঠে মালতী বল্লে,—"নিতে হয় তোমরা নাও,—আমি অমন্ ভিক্ষের দান নিই না।"...কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গে সে কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। অদূরে তখন ভেনের একটা মস্ত চুলীতে সবেমাত্র আগুন দেওয়া হয়েছিল, সেটা দাউ দাউ কোরে জ্বল্‌ছিল, কাপড়খানা সবেগে তা[illegible] উপ[illegible] এবং পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দপ কোরে জ্বলে উঠল।

সকলেই হাঁ, হাঁ কোরে উঠল। সুরেশ্বরী ছুটে গিয়ে কাপড়টা তুলে নিলে। কিন্তু যখন সে তুল্‌লে তখন কাপড়টায় আর কিছু নেই।

মালতীর অচিন্তনীয় কার্যকলাপ দেখে সকলেই স্তম্ভিত। অলকের

মুখখানা অপমানে একবার লাল হ'য়ে উঠল। তা'র মনে হ'ল, ঐ কাপড়টার সঙ্গে তা'রও বুকখানায় যেন মালতী অগ্নি নিক্ষেপ করলে। পর মুহূর্ত্তে তা'র মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। এতকাল জীবনের নানা অবস্থায় নানা লোকের সাথে মিশে, সে বহু অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল; তাই মালতীর কর্ম্মের হেতু বুঝতে তা'র মোটেই দেরী হ'ল না। সে আস্তে আস্তে মালতীর কাছে এগিয়ে গিয়ে শান্তভাবে বল্লে—"তোমাদের পর আমি কোনদিন মনে করিনি বৌদি; আর তোমারাও আমাকে মনে করবার সুযোগ দাওনি; সেইজন্যেই এতটা স্পর্দ্ধা আমার হ'য়েছিল। তবে এটা আমি ভাবতে পারিনি যে, আমার দেওয়া কোন উপহার নিতেও তোমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে! যাই হোক্, যা' কোরে ফেলেছি তার জন্যে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু বৌদি' এটাও তোমাকে বোলে রাখি তোমার মনের কথা অন্য কেউ বুঝতে না পারলেও, আমি পেরেছি। তুমি যে সেদিনের প্রতিশোধ এম্নি কোরে নিতে চাও তা' আমি বুঝেছি। তোমাকে আমার বলবার কিছু নেই, সুধু এইটুকু অনুরোধ, মনটাকে একটু পবিত্র করবার চেষ্টা কর!"

তীক্ষ্নকণ্ঠে মালতী বল্লে, "আচ্ছা, আচ্ছা আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। ছায়া, বন্দনাকে ওসব শেখাও যে, কাজ হবে।"... বোলে সে দুম্ দুম্ কোরে ঘরের ভিতর চলে গেল।

রাগে, দুঃখে, অপমানে বেণীবাবুর এতক্ষণ কণ্ঠ রোধ হ'য়ে গিয়েছিল। অগ্নি বর্ষী দৃষ্টিতে তিনি মালতীকে নিরীক্ষণ করছিলেন। এই সময় হঠাৎ তিনি চীৎকার কোরে উঠলেন,—"চোপরাও—বদ্মাস, ছোটলোক, বেল্লিক,

মেয়েমানুষ কোথাকার ! যত কিছু বলিনা তত বাড়িয়ে তুলেছ ? যা' ইচ্ছে তাই করবে ? দাঁড়াও আজ মজা দেখাচ্ছি । ঘুঘু দেখেচ' ফাঁদ দেখনি"...

মুষ্টিবদ্ধ হস্তে তিনি মালতীর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। অলক তাড়াতাড়ি গিয়ে পিছন হ'তে তাঁ'কে ধ'রে ফেলে বল্লে,—"ছিঃ, কি ছেলেমানুষী করছেন দাদা—?"

—"না, না অলক তুমি বুঝছ না, ও মাগী বড় বাড়িয়ে উঠেছে ; একটু শিক্ষা দেওয়া ওকে দরকার। ও ত' তোমায় অপমান করেনি, —কোরেছে আমাকে। ও শয়তানীকে তাড়িয়ে তবে আমার কাজ। তুমি ছাড় অলক—"

অলক সেস্থান হ'তে তাঁ'কে টান্‌তে টান্‌তে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বল্লে,

—"আপনি বুদ্ধিমান হ'য়ে অমন অবুঝের মত কাজ করছেন কেন ! লোকে দেখলে যে হাসবে। সব রকমের মানুষ নিয়েই সংসারে বাস করতে হয় ;—বিচলিত হ'লে চলবে কেন দাদা।"

—"না, অলক তুমি জান না—ও মেয়েমানুষ সব করতে পারে ! যেদিন থেকে এ সংসারে ও এসেছে, সেদিন থেকেই আমার ঘরের লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে। আমার বাড়ীর সকলেই যেন ওর চোখের বিষ —ও সর্ব্বনেশে মেয়েমানুষ—ওকে না তাড়ালে আর শান্তি নেই।"

—"কিন্তু তাড়িয়ে দিলেই ত' ও শুধরে যাবে না ;—ওকে শোধরাবার চেষ্টা করুন।

—"শোধরাবার জীব ও নয় অলক—এ জীবনে ও আর কখনো শোধরাবে না।"

—"শোধরাবে না এমন কথা হ'তেই পারে না। আপনি পুরুষ একটা স্ত্রীলোক্‌কে নিজের বশে চালনা করতে পারবেন না? হোক্ ও যত মন্দ, কিন্তু তবু ওর ঐ মন্দের মধ্যেই ভালটা প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে; সেটাকে জাগিয়ে তোলাই ত' আপনার মনুষ্যত্ব দাদা।"

অলকের একটা বড় শক্তি আছে, সকল অবস্থাতেই সে লোককে সহসা কথায় আকৃষ্ট কোরে ফেল্‌তে পারে।

বেণীবাবুর প্রজ্বলিত রোষানল অলকের কথার স্নিগ্ধতায় অনেক শান্ত হ'য়ে এলো। তিনি বল্লেন—"তুমি কি বলছ অলক—ও ভালো হ'বে?"

—"নিশ্চয় হবে। ওকে ভালো কোরে তুলতে পারলে তবে ত' আপনার পৌরুষ প্রকাশ পাবে। স্ত্রীর স্বভাবের পরিবর্ত্তন যে স্বামী না করতে পারে তা'র স্বামী হওয়া উচিৎ নয়।"

বেণীবাবু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অলকের পানে তাকিয়ে থেকে কি চিন্তা করলেন। পরে বল্লেন'—"আচ্ছা অলক, আমি চেষ্টা করব ওকে ভালো করতে। কিন্তু ওর ভালো হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।"

...বেণীবাবু প্রথমটায় যেরূপ রেগে গিয়েছিলেন তাতে সকলেরই একটু ভয় হ'য়েছিল যে, আজ একটা কাণ্ড নিশ্চয় তিনি করবেন! মালতীও ভীত কম্পিত কলেবরে আত্মরক্ষার মানসে ছুটে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ কোরে দেয়।

সে ভেবেছিল, আজ একটা ঘোরতর রকমের ফাঁড়া তা'র ঘনিয়ে এসেছে। এত শীঘ্র যে মেঘ কেটে যাবে সে তা' ভাবতে পারেনি। এখন

সে স্বামীকে পুনরায় হাসিমুখে অলকের সাথে বাইরে যেতে দেখে নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

অলক এবং বেণীবাবু কার্য্যান্তরে প্রস্থান করলে সে ঘর হ'তে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো।

(১৩)

..."ও অলক! কাল ত' দশমী!—তুমি ত' কাল আবার কাঙালী খাওয়াবার ব্যবস্থা কোরেছ? কিন্তু এদিকে বেহারীর ত' অসুখ করল—একটা চাকর পাই কোথা?"

—"কেন, আমার চাকরটাকে—

বেণীবাবু লাফিয়ে উঠে অলকের কথায় বাধা দিয়ে বোলে উঠলেন,—

"তোমার চাকর! কাজ নেই ভাই আমার চাকরে—ও তোমার চাকর তোমারই ভাল, আমার দরকার নেই।"

—"কেন আমার চাকর আপনার কি করলে?"

—"করবে আর কি,—পাঁচ মিনিটে প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত কোরে দিয়েছে!—একটা কথা বোঝবার উপায় নেই,—খালি কিড়িমিড়ি! —ওটিকে কোথা থেকে আমদানী কোরেছে ভাই?"

অলক হাস্য-সহকারে বল্লে,—"তা হোক্ দাদা, ব্যাটা খাটতে পারে খুব!"

—"পারে পারুক ভাই, তা'কে আর এনে কাজ নেই। তার চেয়ে তুমি ছায়ার বাড়ী থেকে দু'টো চাকর ধরে আন।"

অলক পূর্ব্ববৎ হাসতে হাসতে বল্লে,—"আচ্ছা, না হয় তাই নিয়ে আসব, কিন্তু এদিকের ব্যাপার কতদূর কি হ'ল? দিদি যে কি কচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। রাত পোয়ালেই কাজ অথচ জোগাড় কিছুই নেই। কোথায় গেল সব?..."

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা বেজে গেছে। কিছু পূর্ব্বে নবমীর সন্ধ্যারতি শেষ হ'য়েছে। সারাদিন নানা পরিশ্রমের পর শ্রান্ত দেহে বেণীবাবু এবং অলক পূজা মণ্ডপের একাংশে বসে আগামী দিনের করণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন।

অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এ বৎসর পূজায় সর্ব্ব-বিষয়েই বেণীবাবু একটু বেশী রকম আয়োজন কোরেছিলেন। অবশ্য এটা সম্ভব হ'য়েছিল অলকেরই উৎসাহে এবং সাহায্যে।

প্রথম প্রথম অলকের সাহায্য নিতে বেণীবাবু রীতিমত সঙ্কোচ বোধ করতেন, কিন্তু অলকের ঐকান্তিক আন্তরিকতার কাছে তাঁ'র সে সঙ্কোচ অল্পদিনেই পরাজিত হয়। অলক বলে,—"যেখানে অন্তরের আদান প্রদান সেখানে নগণ্য অর্থটা কিছু নয়। ভাই বোলে যখন কাছে টেনে নিয়েছেন দাদা, তখন আমার আপনার বোলে কোন' প্রভেদ রাখবেন না। আমার অর্থ সে আপনারই।"

সুতরাং বেণীবাবুর সর্ব্ব কুণ্ঠা অলকের নিকট পরাভব স্বীকার করে।

বাল্যকাল হ'তেই অলক সেবাপরায়ণ। পরোপকার করতে সে ভালবাসে, যার ফলে প্রতি মাসে বহু অর্থই তা'র ব্যয়িত হ'য় দুঃস্থ পালনে। দরিদ্রের ব্যথা সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করে। জীবনের প্রথমাবস্থায় বহু দুঃখই সে ভোগ কোরেছে—তাই কারো দুঃখ সে সহ্য করতে পারে না। দরিদ্রের ক্ষুধায় এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারলে সে যত তৃপ্ত হয় তত তৃপ্তি বোধ হয় স্বর্গলাভেও তা'র হয় না।

বেণীবাবুর গৃহের পূজা উপলক্ষে তাই সে আগামী কাল কাঙালী

ভোজনের এক বিরাট আয়োজন কোরেছে। তবে এর ব্যয় সম্পূর্ণই তা'র নিজের।...

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধভাবে থেকে বেণীবাবু অলককে প্রশ্ন করলেন,

—"কতগুলি কাঙালী হবে বোলে অনুমান কর অলক?"

গম্ভীরভাবে অলক বল্লে,—"প্রায় হাজার দুই—"

—"হাজার দুই! বল কি অলক?"...বেণীবাবু চম্‌কে উঠলেন। তিনি বল্লেন,—"কেন অনর্থক এতগুলো পয়সা বাজে খরচা—"

তাঁ'র কথা শেষের পূর্ব্বেই বিস্মিত কণ্ঠে অলক বল্লে,

—"অনর্থক বাজে খরচা! মানে?"

—"মানে, অতগুলো ভিকিরি গেলান'র কি স্বার্থকতা?"

অলক বল্লে,—"এই তিনদিন ধ'রে পাঁচ-সাত-শো লোক গিলিয়ে আপনি যে স্বার্থকতা অর্জ্জন না কোরেছেন তার সহস্র গুণ স্বার্থকতা এতে লাভ হবে।"

বেণীবাবু বল্লেন,—"কি রকম?"

—"কি রকম তা' বোঝাতে পারব না। কাল যখন তা'রা আপনার দেওয়া অন্নের সামনে বসে আনন্দ করতে করতে খাবে তখন তাদের সেই তৃপ্তিপূর্ণ মুখের পানে তাকিয়ে স্বার্থকতাটা আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।"...কথা কয়টি বলতে বলতে অলকের মুখে যেন একটা স্নিগ্ধ আভা ফুটে উঠল।

বেণীবাবু তা'র মুখের পানে চুপ কোরে তাকিয়ে রইলেন, কোন' কথা বল্‌লেন না।

এমন সময় বন্দনা, ছায়া এবং সুরেশ্বরী সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল।

তাদের দেখে অলক কি একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। সুরেশ্বরী তাড়াতাড়ি তা'র প্রশ্নের পূর্ব্বেই বোলে উঠল,

—"থাম, তোমার বক্তব্য পরে শুনব। এখন আমাদের একটা তর্কের মীমাংসা কোরে দাও।"

—"যথা ?"

—"যথা, এই প্রতিমা পূজার অর্থ কি ?"

—"অর্থ অভিধানে লেখা আছে—"

—"না, না, তামাসা নয় অলক—বল, এই যে প্রতিমা পূজা, এর কোন' অর্থ আছে কি না ? ছায়ার মতে নেই। ও বলে, দেবতা বোলে কোন বস্তুই নেই। মানুষ মনের দুর্ব্বলতার হাত এড়াবার জন্যে দেবতা নামে এক অলক্ষিত বস্তুকে কল্পনা কোরে নিয়েছে। আসলে সব ফাঁকা—দেবতা বোলে কিছু নেই।"

অলক সুরেশ্বরীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে,—"তুমি কি মত প্রকাশ কোরেছ দিদি ?"

সুরেশ্বরী বল্লে, —"আমি বললাম, প্রতিমা পূজার প্রধান কারণ চিত্ত শুদ্ধি—সামান্যের মধ্যে দিয়ে বিরাট বস্তুতে প্রবেশ করার মানসে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা এই মূর্ত্তি পূজার বিধি ব্যবস্থা স্থাপন কোরে গেছেন। আর দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোলেছি, দেবতা যদি না থাকবে তাহ'লে এই ফলে ফুলে ভরা জগতের উদ্ভব হ'ল কি কোরে ? নদীতে জোয়ার ভাঁটা খেলে কেমন কোরে ? চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা এ সব কি প্রকারে আমরা দেখতে পাই,—এদের কে সৃজন করলে ? দেবতা যদি নেই, তবে মানুষ কিসের আশায় কিসের আকর্ষণে সংসারের সকল মায়া বিচ্ছিন্ন কোরে

বিজন বনের মধ্যে যুগ যুগ ধরে তপস্যায় রত থাকে? কি পায় তা'রা? যা'র মোহে সুখ, সম্পদ, আহার, নিদ্রা সকল কিছু পরিত্যাগ কোরে স্বেচ্ছায় ঐ সাধনার ব্রতী হয়? মানুষের জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ কি প্রকারে সম্ভব হয়?"

বিস্ফারিত নেত্র যুগল সুরেশ্বরীর মুখের 'পর স্থাপন কোরে অবাক বিস্ময়ে অলক এতক্ষণ তা'র প্রতিটি কথা অন্তরের সঙ্গে শুনে যাচ্ছিল। এবার তাকে থামতে দেখে বোলে উঠল,

—"চমৎকার! তোমার যুক্তি কাটবার উপায় নেই দিদি।"

সুরেশ্বরী বল্লে,—"কিন্তু ছায়া ত' এ সব কিছু মানতে চায় না। ও বলে, প্রকৃতি হ'তেই বিশ্বের উদ্ভব। আমরা যা' কিছু দেখি—সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি সব কিছুই প্রকৃতির নিয়মে চলে। ঈশ্বর আছে এ কথা ও কোন মতেই বিশ্বাস করতে চায় না।"

মৃদু হাস্যে অলক বল্লে,—"বিশ্বাস না করার মানেই হ'চ্ছে ও অত্যন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী।"

—"তার মানে?"

—"তার মানে, অন্ধকারের বুকেই আলোর বাস—নাস্তিকতার মধ্যেই আস্তিকতা প্রকাশমান। যে বলে ঈশ্বর মানি না সেই বেশী কোরে মানে, এবং মানে বোলেই যুক্তি তর্ক দিয়ে তা'র ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তিটা আরো দৃঢ় কোরে নেয়।"...

পরে সে ছায়ার পানে ফিরে বল্লে,—"কেমন ছায়া, তাই কি না!"

ছায়া মাথাটা নীচু কোরে বল্লে,—"অন্য লোকের কথা অবশ্য আমার জানা নেই, তবে আমি যে ভগবান বিশ্বাস করি না এটা ঠিক। কারণ

ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত সঠিক কোন কথাই কেউ বলতে পারেনি।—কেউ বলে কৃষ্ণই ঠিক, কেউ বলে শিবই ঠিক, আবার কেউ বলে কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা এই সবই ঠিক। প্রকৃত কথা কেউই জানে না। ভগবান যে কি বস্তু এবং তাঁ'র রূপ কি, তা' কেউ বলতে পারে না।"

অলক বল্লে,—"কি কোরে পারবে? কোন' বিরাট বস্তুরই প্রকৃত রূপ কি তা' বলা যায় না। যেমন দেখ, সৃষ্টির সব চেয়ে বড় হ'চ্ছে জল —যার আরম্ভ এবং শেষ আমরা খুঁজে পাই না, সেই জলের প্রকৃত রং বা রূপ কি তা' বোঝা যায় না। নানান্ স্থানে নানা রূপ জল আমরা দেখতে পাই—কোথাও নীল, কোথাও ঘোলা, কোথাও লাল, কোথাও বা কোথাও কাঁচের মত স্বচ্ছ! এই প্রকার নানা রং দেখা যায় বলে জলের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা ত' চলে না। জলের বর্ণ যে রকমই হোক্ তারি ভেতর প্রকৃত জল বিদ্যমান আছেই।— একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ে উঠতে গেলে তাতে কত রং বেরংএর পাথর দেখতে পাওয়া যায়, যাতে কোরে আসল পাহাড়ের রং হয়ত' চাপা পড়ে আছে, কিন্তু ঐ নানা রংএ চাপা পড়লেও পাহাড়ের অস্তিত্ব লোপ হয় না। নানা বর্ণের পাথর বাইতে বাইতেই একদিন পাহাড়ের প্রকৃত বর্ণের কাছে পৌছান সম্ভব হবে।—পৃথিবীর নানা স্থানের মাটী নানা রকম, কিন্তু সেটা যে মাটী তা ঠিক, সে বিষয় কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে না। মাটীর বর্ণ প্রভেদ থাকলেও, সকল মাটীর সাথে সকল মাটীরই যোগাযোগ আছেই। অথচ কোন্ স্থানের মাটীর বর্ণ যে আসল তা' আমরা বল্‌তে পারি না। কাজেই কোন' বৃহৎ বস্তুর আসল রূপ জানা সম্ভবপর নয়। এই বিরাট বিশ্বের স্রষ্টা ভগবান, তাঁর রূপ কি

কোরে মানুষ খুঁজে পাবে? তিনি বিশাল হ'তে বিশালতর! তাই মানুষ সেই অতি বিরাটের সাধনা করবার জন্যে এবং তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্যে সাধ্যানুযায়ী তাঁর রূপ নানা প্রকারে কল্পনা কোরে নিয়েছে। তুমি হয়ত' বলবে, মানুষের কল্পনা ভ্রান্ত! দুর্গা, শিব, কালী, কৃষ্ণ ইত্যাদি সব মূর্ত্তি পূজা করার কি সার্থকতা আছে? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সবেরও রীতিমত স্বার্থকতা আছে। কেন না তোমাকে পূর্ব্বেই বোলেছি, জল, স্থল, পাহাড়ের বর্ণ ভেদের কথা!—কোন' বিরাট বস্তুরই প্রকৃত বর্ণ জানা যায় না। তবে ঐ বর্ণ প্রভেদের মধ্যেই অভেদের সত্বা বর্ত্তমান। যেমন, পিপাসায় যখন আমাদের এক গ্লাস জলের প্রয়োজন হয়, তখন যে রকম বর্ণ বিশিষ্ট জলই আমরা পান করি না কেন, পিপাসা নিবারণ ঠিক হবেই—পাহাড়ে উঠতে গেলে, যে পাথরেই পা রাখি তাতে পাহাড়ের স্পর্শ পাবই—পৃথিবীর যে মাটী মাড়িয়েই চলি তাতে পৃথিবীতে চলাই হবে—পৃথিবীর বুকেই আমাদের পায়ের কাঁপন বেজে উঠবে। অতএব এ বিষয় নিয়ে তর্ক করা মূর্খতা। ছোটর ভেতর দিয়েই বড়কে পাওয়া যায়—বড়র আসল রূপ জানা সম্ভব হয় না—

এখন নিশ্চয় আর দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন' সন্দেহ নেই, এবং মূর্ত্তি পূজা যে অর্থহীন নয় তা' বুঝতে পেরেছ?"...অরুক ছায়াকে প্রশ্ন করলে।

ছায়া বল্লে,—"তা' না হয় মানলুম, কিন্তু এই পাহাড়, জল বা পৃথিবী এদের আমরা যেমন দৃষ্টিতেই দেখি না কেন' দেখতে ঠিক পাবই—যে স্থানের বা পদার্থের রং যেমনই হোক, তাদের স্পর্শ অনুভব করতে আমাদের আটকাবে না। তবে দেবতা সম্বন্ধে যে বস্তুর স্থায়িত্ব তুমি

প্রতিপন্ন করতে চাইছ অলকদা', তাঁকে কেউ কোনদিন দেখতেও পায়নি, আর তাঁর স্পর্শও কারো অনুভবে আসেনি। সুতরাং—"

তাঁকে বাধা দিয়ে অলক বল্লে,—"কে তোমাকে এমন কথা বোলেছে যে, তাঁর রূপ দেখা যায় না বা তাঁর স্পর্শ পাওয়া যায় না বোলে? প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গেই আমরা তাঁর স্পর্শ অনুভব কোরে থাকি আর দেখার কথা যদি বলো—সকলেই তাঁকে দেখতে পেতে পারে—চেষ্টা করলে। প্রমাণ ইতিহাসে পাবে—আমাদের দেশের বহু নর-নারী চেষ্টার দ্বারা তাঁর দর্শন পেয়েছেন। যথা—শঙ্করাচার্য্য, বুদ্ধ, চৈতন্য, জয়দেব, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, বিবেকানন্দ, মীরাবাই, অহল্যাবাই, এইরূপ আরো অসংখ্য নর-নারী সাধনার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ কোরেছেন। চেষ্টা করলে তুমিও পার, আমিও পারি, সকলেই পারে।"

ছায়া বল্লে,—"চেষ্টা ত' বহু লোকেই করে বা করছে। আজীবন চেষ্টা করতে করতে এমন কত লোক শেষে মৃত্যুই বরণ কোরে নিচ্ছে, কিন্তু তবুও দেবতার দেখা তা'রা পায় না কেন? দেবতা যদি আছেনই এবং একজন যখন তাঁর দেখা চেষ্টা কোরে পেয়েছে, তখন আর একজন কেন চেষ্টা কোরে তাঁকে পায় না, এর কারণ কি?"

—"এর কারণ, একজনের সঞ্চিত সম্বল আছে, একজনের নেই। যা'র নেই তা'র সেই সম্বল বা পাথেয় সঞ্চয় করতেই জীবন কেটে যায়। কাজেই প্রকৃত স্থানে আর পৌছান তা'র একজন্মে ঘটে ওঠে না।"

—"কথাটা ঠিক বুঝ্লুম না অলকদা'—"

—"বুঝলে না? আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি শোন…আমাদের ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে কাশ্মীর অবস্থিত। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এত সুন্দর যে লোকে তা'কে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা কোরে নাম দিয়েছে 'ভূ-স্বর্গ!' কত লোক সেখানে গেছে, কত লোক যাচ্ছে, আবার কত লোক যাবে। যা'রা সেখান হ'তে ফিরে এসেছে তাদের কাছে সেথাকার কত কথা শুনতে পাওয়া যায়—বই পড়ে সেখানকার নানা বিষয় জানতে পারা যায়। ঐ সব পাঁচখানা বই পড়ে এবং লোকের মুখে কাশ্মীরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের নানা কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে কাশ্মীর দেখবার সাধ জাগল। অথচ আমি গরীব, কাশ্মীর যেতে হ'লে যত অর্থের প্রয়োজন, আমার তা' নেই। কিন্তু আমার বাসনা এত প্রবল যে, যে কোন উপায়েই হোক্ আমাকে যেতে হবে। অর্থের বাক্স এদিকে আমার একেবারেই শূন্য। তখন আমার একমাত্র চেষ্টা হ'ল অর্থের শূন্য বাক্স পূর্ণ করা—কাশ্মীরের পাথেয় সঞ্চয় করা।…যাই হোক্ শেষে ঐ সৌন্দর্য্যপূর্ণ কাশ্মীর যাত্রার আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করতে করতে এবং পাথেয় সঞ্চয় করতে করতে একদিন সময় এলো—বাক্সে দেখলুম কাশ্মীর যাবার মত অর্থ সঞ্চিত হ'য়েছে। আমি কাল-বিলম্ব না কোরে তখন কাশ্মীর উদ্দেশে যাত্রা করলুম। কিন্তু যখন যাত্রা করলুম তখন আমার জীবনের শেষ দিন আগত। কাজে কাজেই মধ্য পথেই আমাকে মৃত্যু বরণ কোরে নিতে হ'ল—কাশ্মীর দেখা আমার ঘটে উঠল না।

…তুমি প্রশ্ন করতে পার,—এত ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও কেন আমি কাশ্মীর দর্শনে বঞ্চিত হলুম? তার উত্তর—যখন থেকে আমি পাথেয় সঞ্চয় করতে আরম্ভ কোরেছি, তার চেয়ে অনেক পূর্ব্ব হ'তে আমার

করা উচিৎ ছিল, আমি তা করিনি; যার ফলে মাঝ পথে গিয়েও আমি বঞ্চিত হলুম।"

—"তাহ'লে ও চেষ্টার ত' কোন' স্বার্থকতা নেই—সুধু পণ্ডশ্রম!"

—"কে বললে পণ্ডশ্রম? এ জন্মে ঐ আকাঙ্ক্ষা জড়িত চেষ্টার দ্বারা আমি যতদুর অগ্রসর হ'য়েছি, পরজন্মে ঠিক সেইখান হ'তেই আবার আমার গতি আরম্ভ হবে।"

—"কিন্তু পরজন্ম যে আছে তা'র প্রমাণ কি?"

—"ও,—তা'হলে তুমি জন্মান্তরও মান না?"

—"না। কারণ জন্মান্তরের কোন' প্রমাণ পাই না বোলে।"

—"প্রমাণ না পাওয়ার কারণ? প্রমাণ ত' যথেষ্ট আছে। প্রমাণ তুমি, প্রমাণ আমি, প্রমাণ বিশ্ব সংসারের সকল জীব। জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম এত চিরন্তনী সত্য-একে ত' এ'ড়িয়ে যাওয়া চলবে না—যুক্তি তর্ক দিয়ে মানুষ এ মহা সত্যকে উড়িয়ে দিতে কোন মতেই পারবে না। আচ্ছা একটা ছোট কথায় তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।—বল দেখি, গাছের জন্ম কেমন কোরে হয়?"

—"বীজ হ'তে—"

—"আর ঐ বীজ কোথা থেকে আসে?"

—"গাছ থেকে—"

—"বেশ; এখন তা'হলে বুঝলে ত', গাছ হ'তে বীজের জন্ম, বীজ হ'তেই আবার গাছের জন্ম?—সৃষ্টির প্রথম থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। তেম্নি মানুষেরও জন্ম হ'তে মৃত্যু, মৃত্যু হ'তে জন্ম। একটা গাছ যদি বীজ রেখে মরে তবেই আবার সেই বীজ হ'তে তার জন্ম হবে,

নচেৎ নয়। তেম্‌নি মানুষের মৃত্যুর পর জন্মের কারণ হ'চ্ছে অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা। ঐ আশা-আকাঙ্ক্ষা বীজ স্বরূপ র'য়ে গেল মানুষের মৃত্যুর পর জন্মের কারণে।...আমার কাশ্মীর যাওয়া এজন্মে হ'ল না, অতৃপ্ত আশা বুকে কোরে মরতে হ'ল; সেই আশা বীজ স্বরূপ পৃথিবীর বুকে বপন কোরে আমি গেলুম বোলে আবার আমায় জন্মাতে হবে। এ জন্মের চেষ্টার দ্বারা যতদূর আমি এগিয়ে গেলুম, সে জন্মের চেষ্টা তারপর হ'তে আরম্ভ হবে, এবং আমি হয়ত' কাশ্মীর পৌঁছাতে পারব।— অন্ততঃ আমার মত এই।"

—"আচ্ছা জন্মান্তর যদি আছে, তবে আমরা পূর্ব্ব-জন্মের কথা জান্‌তে পারি না কেন?"

—"অত' গভীর চিন্তা করা বড় সহজ কথা নয়। তুমি যখন এক বৎসর কি ছয় মাসের মেয়ে ছিলে, তখন কেমন কোরে হাসতে, মায়ের কোলে শুয়ে কেমন কোরে হাত-পা ছুড়ে খেলা করতে, তা' কি এখন ভাবতে পার?...পার না। অত্যন্ত পুরাতন কথা মনের মধ্যে চাপা পড়ে যায়—সুদূর অতীতকে তাই আমরা চিন্তায় খুঁজে পাই না। তাও মাঝে মাঝে পূর্ব্ব-জন্মের ক্ষীণ স্মৃতি আমাদের মনের তলে আলোক পাত করে। যেমন, একটা জায়গায় জীবনে কখনো যাইনি, হঠাৎ সেখানে গিয়ে মনে হ'ল, যেন জায়গাটা বড় চেনা চেনা—কতবার যেন এসেছি! জায়গাটার কোথায় কি আছে তাও আমার জানা! আবার অনেক সময় এমন এক একটা লোক দেখতে পাওয়া যায় যে, যাঁকে কখনো জীবনে দেখিনি, অথচ মনে হয় তা'কে খুব চিনি এবং শুধু যে চিনি তা' নয়, রীতিমত পরিচয় আছে বোলেই মনে হয়। এ সবের কারণ কি?

কারণ পূর্ব্ব-জন্মের স্মৃতি ! সুতরাং এ সব দেখে শুনে আর জন্মান্তরে কোন অবিশ্বাস করা চলে না।"

অলক ছায়ার পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে,—"আর কি কোন' বিষয় তোমার সন্দেহ আছে ?"

ছায়া আস্তে আস্তে অলকের কাছে এগিয়ে এসে তা'র পায়ের ধূলা মাথায় স্পর্শ কোরে বল্লে,—

"না, অলকদা—আর আমার কোন' বিষয়ে সন্দেহ নেই। তুমি আমার সকল সন্দেহ দূর কোরে দিয়েছে।"

সুরেশ্বরী ছায়াকে বল্লে,—"কেমন, শেষ পর্য্যন্ত আমারই জিত হ'ল ত' ?"...

ছায়া বল্লে,—"তা, বোলে তুমি আমাকে তর্কে হারাতে পারনি—"

বেণীবাবু এতক্ষণ অলকের প্রতিটি কথা মন দিয়ে শুনছিলেন এবং মনে মনে তা'কে তারিফ করছিলেন। এবার তিনি বোলে উঠলেন,

—"উঃ! বাস্তবিক : আমার মনে হয় অলকের প্রফেসর হওয়া উচিৎ ছিল ; তাহ'লে অনেককে জ্ঞান দান কর'ত পারত' !"

অলক একটু হাসলে অন্য সকলেই মনে মনে সে কথাটা স্বীকার কোরে নিলে—সত্যই অলক প্রফেসর হ'লে অনেক নাস্তিকের উপকার সাধন হ'ত।

পরদিন প্রভাত হ'তে আরম্ভ কোরে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর এই সবে মাত্র শ্রান্ত অবসন্ন দেহে অলক একটু বিশ্রাম পেয়েছে।

যথা সময়ে মহা-উৎসাহ সহকারে অলকের দরিদ্র-নারায়ণ সেবা সম্পন্ন হ'য়ে গেছে, এবং কিছু পূর্ব্বে প্রতিমা বিসর্জ্জনান্তে অলক এবং বেণীবাবু গৃহে প্রত্যাগমন কোরেছেন।

হিন্দুদিগের এই দিনটি বড়ই আদরের! চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী এইদিনে—আত্মীয়, স্বজন, প্রতিবাসী, ইত্যাদি সকলেই সকলার কাছে পেয়ে থাকে প্রীতির আলিঙ্গন—শুভ-কামনা। এই দিনে আমরা ভুলে যাই শত্রুতা, ভুলে যাই বিবাদ--দ্বেষ, হিংসা মন থেকে যায় সরে। যদিও এ আনন্দ ক্ষণেকের; তথাপি বড় মধুর, বড় তৃপ্তি দায়ক!...

অলক বেণীবাবু এবং সুরেশ্বরীকে প্রণাম করতে তাঁ'রা প্রাণ খুলে তা'কে আশীর্ব্বাদ করলেন। ছায়া থেকে আরম্ভ কোরে গৃহের সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা অলককে এসে এসে প্রণাম কোরে গেল! কেবল বন্দনা যখন তা'কে প্রণাম করতে এলো, সে লাফিয়ে উঠে বল্লে,

—"আরে, কি পাগল! মা কি কখনো ছেলেকে নমস্কার করে?... ছেলেকে আশীর্ব্বাদ করতে হয়।"...কথা শেষে সে যুক্তকর কপালে স্পর্শ কোরে বন্দনাকে নমস্কার জানালে।

বন্দনার মুখটা লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠল। সে ছুটে সেখান হ'তে পালিয়ে গেল। তা'র অবস্থা দেখে ছায়া এবং সুরেশ্বরী খিল খিল কোরে হেসে উঠল।

কিছুক্ষণ কাটার পর এক সময় ছায়া অলককে জিজ্ঞাসা করলে,

—"একটা কথা তোমায় বলব অলকদা' ?"

—"বলো—"

—"আচ্ছা অলকদা', তুমি কৈ বৌদি'কে নমস্কার করলে না ?"

—"না।"···একটু সময় চুপ কোরে থেকে অলক বল্লে,

—"দেখ ছায়া, অন্তরের ভক্তি যদি না থাকে—প্রাণের টান যদি না থাকে, তাহ'লে স্বধু লোক দেখান একটা নমস্কার করার কোন' মানে হয় না। তাতে আরো মনটা সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে—শান্তি পাওয়া ত' দূরের কথা। বৌদি'কে আমি নমস্কার করিনি তার কারণ তাঁ'র প্রতি আমার মোটেই ভক্তি নেই।"

ছায়া বল্লে,—"ঠিক বোলেছ অলকদা',—সম্মান পাওয়ার যোগ্যতা না থাকলে তা'কে সম্মান দিতে যেন একটু কুণ্ঠায় বাধে।"...

সুরেশ্বরী অলককে প্রশ্ন করলে,—"অলক ! আজ রাত্তিরে ত' আর বাড়ী যাবে না ?"

অলক বল্লে,—"না, আজকে যেতেই হবে। ক'দিন যাইনি আমার বনমালীচন্দর যে কি করছেন তা' কে জানে !"...কথার সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল। বল্লে,—"রাতও অনেক হ'ল বোধ হয় ! এবার যাওয়া যাক্ দিদি। মায়ের সঙ্গে একবার দেখা কোরে যাই—না হ'লে আর উপায় থাকবে না।"...

সে বন্দনার সন্ধানে অন্তত্র প্রস্থান করলে।

*　　*　　*　　*

পরদিন অলক তখনও শয্যা ত্যাগ করেনি। কয়দিন ধ'রে একটানা

পরিশ্রমে তাঁর দেহটা বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিল। প্রভাত বহুক্ষণ হ'য়েছে, এখন বেলা প্রায় সাড়ে আটটা বাজে, তবুও যেন তাঁর উঠতে ইচ্ছা করছে না।

ভৃত্য বনমালী ইতিমধ্যে কয়েকবার চা দিতে এসে ফিরে গেছে—বাবুর নিদ্রার ব্যাঘাত করতে সাহস পায়নি।...এই সময় পুনরায় সে ধীর চরণে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ কোরে আস্তে আস্তে ডাকলে,

—"বাবু!—বাবু!"

—"কি?"...অলক ধমক দিয়ে উঠল।

ভীত কণ্ঠে বনমালী বল্লে,—"জনে বাবু দেখা করিবা সকালে আসিছন্তি—"

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে অলক প্রশ্ন করলে,—"কিঃ?—কে বাবু?"

—তাঁর কথা শেষ হ'তে না হ'তে কক্ষ মধ্যে যিনি প্রবেশ করলেন তাঁকে দেখেই সে চমকে উঠল!

—"দাদা! কি ব্যাপার? এত সকালে?"

...চক্ষু দুটি রগড়াতে রগড়াতে সে শয্যার 'পর উঠে বসল! বেণীবাবুর দিকে একবার তাকিয়ে সে বল্লে,—"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন দাদা, বসুন!"......পরে বনমালীকে বল্লে,—"এই গাধা! দু' কাপ চা নিয়ে আয়!"...বোলে সে পুনরায় হাসতে হাসতে বল্লে,—"কদিন খাটা খাটুনিতে শরীরটা বড় খারাপ খারাপ লাগছিল, তাই সকালে যেন আর উঠতে ইচ্ছে হ'ল না—"

সহসা বেণীবাবুর বিমর্ষ পাংশু মুখের পানে তাকিয়ে তাঁর মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। বিস্মিত কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করলে,

—"এ কি! আপনার মুখ চোখের অবস্থা এ রকম কেন? কি হ'য়েছে দাদা?"

ছল ছল নেত্রযুগল অলকের মুখের 'পরে নিবদ্ধ কোরে বাষ্প জড়িত কণ্ঠে বেণীবাবু বল্লেন,

—"অলক—অলক! আমার মৃত্যু ছাড়া আর উপায় নেই ভাই; আমার—"

তিনি আর বলতে পারলেন না, তাঁ'র কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো। টপ টপ কোরে তাঁ'র গণ্ড বেয়ে হু'ফোঁটা অশ্রু মাটীতে ঝরে পড়ল।

অলক কিছুই বুঝলে না। এক রাত্রের মধ্যে এমন কি হ'তে পারে, যাতে তাঁ'র এই অবস্থা সম্ভব হ'ল? অলক জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁ'র এমন কাতর মুখখানির পানে তাকিয়ে রইল।

ক্ষণকাল স্তব্ধতার মধ্যে কাটার পর বেণীবাবু অকস্মাৎ অলকের হাত দু'টি ধরে বোলে উঠলেন,

—"আমার সব গেল অলক—সব গেল,—রাস্তায় দাঁড়ালুম বৌ ছেলে নিয়ে—"

গভীর বিস্ময়ে অলক প্রশ্ন করলে,—"কেন, কি হ'ল হঠাৎ? রাস্তাতেই বা দাঁড়াতে যাবেন কেন?"

—"আর কেন; এই ভাগ্য!"...কপালে চপেটাঘাত কোরে তিনি বল্লেন,

—"দত্তদের কাছে আমার বাড়ী ঘর সব পনের হাজার টাকায় বাঁধা ছিল, তা' ত' তুমি জান অলক? এখন তা'রা সুদে আসলে সতের হাজার টাকার দাবী দিয়ে আমার নামে নালিশ কোরেছে। এই দেখ—"

শমনটী অলকের হাতে দিয়ে তিনি বল্লেন—"আমি পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরী করি, এ মামলার খরচ কি কোরে চালাব ভাই? আর দেনাই বা শুধবো কি কোরে? আমায় একটা বুদ্ধি দাও অলক—"

নীরবে একটু কি চিন্তা কোরে অলক বল্লে,

—"তা' এর জন্যে আর ভাবনার কি আছে দাদা? আপনি যদি অনুমতি দেন তাহ'লে ও টাকাটা আমিই দিয়ে দিতে পারি—"

—"হ্যাঁ! তুমি, তুমি আমাকে এতগুলো টাকা সাহায্য করবে?"...

বেণীবাবু এতখানি আশা অলকের কাছে করেননি; তিনি শুধু তাকে ভালবাসেন এবং কনিষ্ঠের মত স্নেহ করেন বোলে, প্রভাতে শমনটী হাতে পেয়েই তাঁর কাছেই আগে ছুটে এসেছেন কাহাকেও না জানিয়ে—কেবল তাঁর একটা পরামর্শ নেবার জন্য। কিন্তু অলকের আশাতীত উক্ত প্রস্তাবে তাঁর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না।

তিনি অলকের হাত দুটো নিজ কম্পিত হস্তের মধ্যে টেনে নিয়ে অপরিসীম বিস্ময়ে বোলে উঠলেন,

—"অলক! তুমি—তুমি দেবে!"

তাঁকে বাধা দিয়ে অলক বল্লে,—"এ আর আশ্চর্য্যের কথা কি? ভায়ের অভাবে ভাই যদি না দেখে, তবে কে দেখবে? আমাকে যখন ভায়ের স্থান দিয়েছেন, তখন এটুকু উপকার করা ত' এমন কিছু বেশী করা নয় দাদা।"

বেণীবাবু স্তব্ধ নেত্রে তা'র পানে তাকিয়ে রইলেন কোন' কথাই তাঁ'র কণ্ঠ হ'তে উচ্চারিত হ'ল না।

...কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নিজ সঞ্চিত অর্থ হ'তে অলক বেণীবাবুর

প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ তাঁ'কে এনে দিলে। অলকের উদারতায় স্তম্ভিত বেণীবাবু প্রথমটা কোন কথা বলতে পারলেন না। পরে অলকের হাত ধ'রে তিনি বল্লেন,

—"অলক তোমার এ উপকার জীবনে ভুলব না! কিন্তু ভাই তোমার কাছে, আমার একটা অনুরোধ আছে বল রাখবে?"

—"বলুন—"...অলক তাঁ'র পানে তাকিয়ে বল্লে।

বেণীবাবু কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তা'র পানে চেয়ে কি চিন্তা কোরে বল্লেন,

—"দেখ ভাই, এই টাকা পয়সা বড় খারাপ জিনিষ। মানুষের মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট কোরে দেয়। অবশ্য তোমার সঙ্গে আমার সেরূপ হবার কোন আশঙ্কা নেই তবুও আমার অনুরোধ—এই টাকাগুলোর একটা পাকা ব্যবস্থা কোরে, তোমায় একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দেব—সেটা তোমায় নিতেই হবে! বল নেবে?"

অলক একটু হেসে বল্লে,—"তাতেই যদি আপনি খুসী হন—দেবেন।"

বেণীবাবু বল্লেন,—"হ্যাঁ ভাই! যদিও জানি আমার দেবার মত সংস্থান নেই, তবু আমার চাড় থাকবে, এবং তাতে কোরে আমার অন্ততঃ একটু লাভ হবে—আমি বুঝে চলতে পারব।"

অলক কোন' কথা বল্‌লে না, সুধু মৃদু হাস্যে তাঁ'র কথায় সায় দিয়ে গেল।

(১৫)

পাঁচ বৎসর পরের কথা......

পরিবর্ত্তনশীল জগতের বহু পরিবর্ত্তনই এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরে সাধিত হ'য়েছে।

'মানুষ' এই বিশ্বেরই অধিবাসী, কাজেই তা'রাও এই পরিবর্ত্তনের হাত এড়াতে পারেনি। তাদেরও জীবন পরিমুষ্টি কোরে পরিবর্ত্তনের বহু ঝড় ব'য়ে গেছে। সে ঝোড়ো হাওয়ার ঘূর্ণাবর্ত্তে কত জীবন হ'ল লক্ষ্যচ্যুত—স্তব্ধ হ'ল প্রাণের স্পন্দন। আবার কত জীবন নবরূপে পেলো প্রাণ। কত মন কত মনের কূল হ'তে বিদায় নিলে, আবার কত মনে এসে লাগলো কত নূতন মনের ঢেউ।

বেণীবাবুর পরিবারস্থ প্রায় সকল প্রাণীরই মন পরিবর্ত্তনের এ ঝটিকাবাতে আক্রান্ত। বিশেষ কোরে বন্দনার এবং মালতীর :—

মালতীকে আর চেনা যায় না,—কালের চিকিৎসায় সে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তা'র দুর্নীতি পূর্ণ মনটায় একটা আবারণ ঢাকা পড়ে গেছে। স্বামীকে এখন সে ভক্তি দেখাতে শিখেছে, স্বামীর আজ্ঞা পালনের চেষ্টাও করে। স্বামীর সুখ অসুখের প্রতি এখন তা'র দৃষ্টি প্রখর। কেন, তা সেই জানে। তা'র মনের কথা জানা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি, সে নিজে জানে কি না সন্দেহ!

বেণীবাবুও স্ত্রীর অকস্মাৎ এ অসম্ভব পরিবর্ত্তনে সুখী ছাড়া অসুখী হন্‌নি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্বামী স্ত্রীর বৈরী ভাব প্রথম জীবনে যতটা থাকে, ঠিক ততটা পরিমাণেই কমে যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রভুত্ব ততদিন থাকে, যতদিন শরীর এবং মন সুস্থ থাকে। বার্দ্ধক্যে অনেক স্বামীকেই শেষ পর্য্যন্ত স্ত্রীর আনুগত্য স্বীকার করতে হয়—তা' সে যে কারণেই হোক্। আবার যদি স্ত্রী দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় পক্ষের হয় তা'হ'লে ত' কথাই নেই।

বেণীবাবুর জীবনেও এ নিয়মের বৈপরীত্য ঘটেনি। বয়সও এখন তাঁ'র প্রায় ষাঠের কোটায় পৌঁছিয়ে গেল—শরীরেও আশ্রয় কোরেছে নানা ব্যাধি। কাজেই সেবার যত লোকই থাক্ স্ত্রীর মত মিষ্টি কারো সেবাই তাঁ'র লাগে না। তার উপর মালতী তাঁ'র 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা'। তরুণী না হ'লেও মালতীর এখনো প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছাতে দেরী আছে। সেই কারণে ব্যাধিগ্রস্ত শরীর মন নিয়ে বেণীবাবু আজকাল মালতীর 'পর একটু বেশী রকমই ঝুঁকে পড়েছেন। তাঁ'র মরা গাঙে সহসা যেন জোয়ারের আবির্ভাব হ'য়েছে। মালতীও তাঁ'র এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে এর ভিতর অনেক কার্য্য কোরে নিয়েছে।

তা'র সকল কার্য্যের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান যেটি, সেটি হ'চ্চে অলকের সাথে তাঁ'র একটা বিচ্ছেদ ঘটান। উদ্দেশ্য তা'র ইতিমধ্যে অনেকটা সিদ্ধির পথেও এগিয়ে এসেছে। যে বীজ সে দিব-রাত্র তাঁ'র কর্ণে বপন করে, সে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হ'তে আরম্ভ কোরেছে। এতদিন হয়ত' এ গৃহে আগমন অলকের বন্ধই হ'য়ে যেত, শুধু হয়নি অর্থের খাতিরে।

অলকের কাছে বেণীবাবু বিস্তর ঋণী। কর্জ্জ হিসাবে তা'র কাছ হ'তে এত অর্থ তিনি এর ভিতর নিয়েছেন, যাতে কোরে অলকের অর্থ ভাণ্ডার প্রায় শূন্য হ'য়ে এসেছে। অবশ্য এ ঋণ যে তিনি কোনদিন পরিশোধ করবেন, এমন কোন' সন্দেহই তাঁ'র ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। অলকও এ জন্য দুঃখিত বা ব্যস্ত নয়, কারণ প্রাপ্তির আশা রেখে সে বেণীবাবুর উপকার করেনি। সে বন্দনাকে ভালবাসে, স্নেহ করে; যে জন্য স্বার্থহীন ভাবেই সে বন্দনার পিতার উপকার কোরেছে। কিন্তু তা'র সে উপকার বা ভালবাসার যথার্থ মূল্য এ সংসারের কেউই দিতে পারেনি। একমাত্র সুরেশ্বরী ব্যতীত সকলেরই মন তা'র উপর হ'তে বহু দূরে সরে গেছে—এই কয় বৎসরের মধ্যে।

বন্দনা এখন আর সে বন্দনা নেই—কালের প্রভাবে তা'র শরীর এবং মন দুই গেছে বদলে—মনের ধারা তা'র সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বইতে সুরু কোরেছে। যে অলকের মুহূর্ত্ত অদর্শনে একদিন সে বিশ্বসংসার অন্ধকার দেখত, এখন সেই অলকের সঙ্গই সে সর্ব্বদা এড়িয়ে যেতে চায়। অলকের 'মা' ডাকে এখন তা'র হৃদয়ে পুলক সঞ্চার হয় না—অত্যন্ত তিক্ত বোলেই মনে হয়। যে অলকের প্রতিটি আজ্ঞা বা উপদেশ একদিন তা'র অন্তর আকাশে উজ্জ্বলতর নক্ষত্রের মতই বিকসিত হ'য়ে উঠত, এখন সেই অলকের প্রত্যেক কথায় তা'র অন্তরে ঘনিয়ে আসে যেন শ্রাবণ রজনীর অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঘ ভার। এমন কি অলকের মিষ্ট কণ্ঠ-সঙ্গীতও এখন তা'কে তুষ্ট করতে সমর্থ হয় না।

অলকও মর্ম্মে মর্ম্মে তা'র এ অবজ্ঞা উপলব্ধি করে। তা'র বুকের তলে একটা অব্যক্ত বেদনা আছাড় খেয়ে পড়ে। বন্দনার হাব-ভাব

লক্ষ্য কোরে তা'র মুখে ফুটে ওঠে বিষাদের ম্লান হাসি—রিক্ততায় শূন্য অন্তরখানা হাহাকার কোরে কেঁদে ওঠে। তবুও সে আসে—অবজ্ঞার কশাঘাতে জর্জ্জরিত মন নিয়ে দিনান্তে অন্ততঃ একবারও তা'র বন্দনাকে দেখা চাই—তা'কে না দেখলে সে থাকৃতে পারে না।

বন্দনা তা'কে যতই উপেক্ষা করুক—সে উপেক্ষার বোঝা তা'র বুকে যতই ভার দান করুক—তবুও সে আসে; কেন না সে যে সত্য সত্যই বন্দনাকে ভালবাসে। তা'র ভালবাসার মধ্যে ফাঁকি ত' কোথাও নেই!...

সুরেশ্বরী অলকের বেদনা অনুভব কোরে অন্তরে ব্যথা পায়, কিন্তু প্রতিকার করবার মত কোন সামর্থই তা'র নেই। বন্দনা এখন আর পূর্ব্বের সে বালিকা বন্দনা নেই—এখন সে অষ্টাদশী এবং শিক্ষিতা—ইউনিভারসিটীর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী; কাজেই তা'কে এখন কোন' উপদেশ দিতে যাওয়া সুরেশ্বরীর শোভা পায় না। আর সেই বা তা'র উপদেশ গ্রাহ্য করবে কেন? তথাপি যদি কোনদিন অলকের বেদনাতুর মুখখানা দেখে অসহ্য ব্যথায় সুরেশ্বরীর প্রাণটা কেঁদে ওঠে, তাহ'লে সে আর থাকৃতে না পেরে বন্দনাকে দু' এক কথা বলতে যায়। উত্তরে বন্দনা ভ্রূকুটি কোরে বলে,

—"দেখ পিসীমা! তোমাদের উপদেশ, আদেশ মেনে চলবার মত বয়েস আমার আর নেই। এখন আমি যেটা ভালো বুঝব সেইটাই আমার পক্ষে শুভ। একদিন হয়ত' অলককে আমি ভক্তি শ্রদ্ধা করতুম কিন্তু তাই বোলে যে চিরদিন তা'কে শ্রদ্ধা কোরে চলতে হবে তার কোন মানে নেই। আর এমন কি গুণ ওর আছে যাতে কোরে ওকে শ্রদ্ধা

করতে হবে ? কত দূর লেখা পড়া কোরেছে—ও কি জানে ? ওর স্বরূপ যতদিন না জানতে পেরেছি, ততদিন ওকে ভক্তি কোরেছি ; কিন্তু এখন জেনেছি ও শ্রদ্ধার সম্পূর্ণ অযোগ্য। একটা চরিত্রহীন মাতালকে কোন ভদ্র মহিলা শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে না। তুমি এখনো হয়ত' ওর কুচরিত্রের কথা জান না, তাই ওর সাথে কথা বলতে দ্বিধা করো না ;— জানতে যদি তাহ'লে তোমার নিজেরই লজ্জা হ'ত। বাবা পূর্ব্বে ওকে যত স্নেহ করতেন, এখন কি তত করেন ?...করেন না। কারণ ওকে তিনি চিনেছেন। এখন যেটুকু করেন শুধু পয়সার খাতিরে।...এই ত' সেদিনও বিলাসদা'র কে এক বন্ধু নাইট শো'য়ে সিনেমা দেখে ফেরবার সময় দেখে যে, ও মাতাল অবস্থায় একটা বিশ্রী গলির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। বিলাসদা'র কাছে ঐ কথা শুনে আমার মাথা যেন লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশে গেল। ওর মুখে 'মা' ডাক শোনাও পাপ। কে বলতে পারে ওর মনের কথা ?—ও লোক সব করতে পারে। ওর নিজের মা থাকলেও ওর মুখ দেখত না। তুমি কি না আবার ওর হ'য়ে— হুঁ:—"

কথা শেষে সুরেশ্বরীর মুখের পরে একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ হেনে সে প্রস্থান করে। সুরেশ্বরী অবাক হ'য়ে তা'র গমন পথের পানে চেয়ে থাকে, কিছু প্রতিবাদ করতে পারে না। পরে সে আপন মনে বলে,

—"সব নিমকহারাম অকৃতজ্ঞের দল ! যা'র দয়ায় আজো মুখে অন্ন উঠছে, তা'কেই কি না মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া ! এ কৃতঘ্নতা অনেক সহ্য করলেও, ভগবান সইবে না। যা'র শিক্ষায় এত বড় বড় কথা শিখেছ বন্দনা—যা'র পয়সায় আজো তোমার লেখাপড়া

সম্ভব হ'চ্ছে—তা'রই প্রতি এত ঘৃণা! এর ফল কিন্তু ভাল নয়। যে ভালবাসা দোলে-পিষে নষ্ট কোরে ফেলছ, সে ভালবাসা তোমার ও শত বিলাস এলেও দিতে পারবে না। সুধু বিলাস কেন, পৃথিবীর কেউই ও জিনিষ দিতে পারবে না। একদিন এর জন্যে তোমায় কাঁদতে হবে। অলকের বুকে আজ যতখানি আঘাত দিচ্ছ, একদিন ঐ অলকের জন্যেই তোমাকে আবার অতখানি ব্যথা পেতে হবে।"

সুরেশ্বরী মনে মনে ভাবে, এবার অলক এলে বেশ কড়া কোরে তা'কে বল্‌বে—কেন সে এ বাড়ীতে আসে? তা'র কি মরবার আর জায়গা নেই—এবাড়ী ছাড়া? কি দরকার এত অপমান স'য়ে এখানে আসবার? পাওনা টাকার জন্যে কেন সে না'লিশ করে না? তাহ'লে একবার দেখি এত দম্ভ এদের কোথায় থাকে। বিলাস এদের কত সুহৃদ —কেমন সে এদের বাঁচায় তাহ'লে একবার দেখি।

ঐরূপ কত কথা সে মনে মনে আন্দোলন করতে থাকে। রোজই সে ভাবে, আজ অলক এলে নিশ্চয়ই সে তা'কে চ'লে যেতে বলবে।

কিন্তু যেই অলক আসে তখুনি সে সব ভুলে যায় তা'র মলিন মুখখানি দেখে।

(১৩)

বিলাস নামক যে ব্যক্তির কথা কিছু পূর্ব্বে উল্লিখিত হ'য়েছে তা'র একটু পরিচয় ও প্রাক্তন ইতিবৃত্ত এখানে দিয়ে রাখা প্রয়োজন।

বিলাস বন্দনার জীবনে এক নবাগত অতিথি। গত তিন বৎসর যাবৎ বেণীবাবুর গৃহে তাঁ'র যাতায়াত আরম্ভ হ'য়েছে।...শোনা যায়, এক সময় নাকি বিলাসের পিতার সহিত বেণীবাবুর যথেষ্ট সখ্যতা ছিল, এবং তাঁ'রা নাকি পূর্ব্বে বেণীবাবুর প্রতিবেশী হিসাবে বহুদিন এক সাথে বস-বাস কোরেছিলেন। তারপর কর্ম্ম গতিকে উভয়দের বিচ্ছেদ হয়,—কর্ম্মবশতঃ বিলাসের পিতাকে পশ্চিমে বিদায় নিতে হ'য়েছিল, বিলাস তখন ছেলেমানুষ।...

বিলাস ছিল পিতার একমাত্র সন্তান; তাই একটু বিলক্ষণ আদরের মধ্যেই মানুষ হ'তে থাকে।

পরে পিতার ইচ্ছানুযায়ী বিলাসকে কাশীতে থেকে লেখাপড়া করতে হয়। অভিভাবকহীন ভাবে বিলাস কাশীতে থাকত এবং পড়াশুনা করত! পিতা থাকতেন কানপুরে। খরচের অতিরিক্ত অর্থ সে পিতার কাছ হ'তে পেত। যার ফলে সল্পকালের মধ্যেই সে রীতিমত বিলাসী হয়ে ওঠে।

লেখা পড়ায় সে কোনকালেই তেমন মনোযোগী ছিল না, তার উপর পিতার নিকট 'হ'তে অত্যধিক খরচ প্রাপ্তিতে সে বিলাসিতার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়। কেবল মাত্র তাই নয়, সঙ্গ দোষে তা'র স্বভাব নষ্ট হ'তেও দেরী হয়নি। সরস্বতীকে জবাব দেবার মত অবস্থাও তা'র এসেছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তা' ঘটে ওঠেনি। পিতার ঐকান্তিক অনুরোধেই হোক্ বা তাঁ'র পুণ্যের জোরেই হোক্, অতি কষ্টে একদিন সে বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটি থেকে বি. এ. উপাধি লাভ করে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও এম, এ, পড়তে থাকে। তারপর বার কয়েক পর পর এম, এ পরীক্ষায় ফেল কোরে সে লেখা পড়ায় ইস্তোফা দিয়ে দেয়।

ইতিমধ্যে সঞ্চয়ী পিতাও বহু বিত্ত সম্পত্তি বিলাসী পুত্রের সুখ শান্তিতে জীবন যাপন করবার জন্য সঞ্চিত রেখে মারা যান। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি আরো একটি কাজ কোরে গিয়েছিলেন—পুত্রের ভবিষ্যৎ বাসের জন্য কলিকাতায় একটি সুন্দর অট্টালিকাও কোরে রেখে যান, এবং বেণীবাবুই মধ্যস্থ হ'য়ে উহা করান। কারণ এর মধ্যে বেণীবাবুরও একটু স্বার্থ জড়িত ছিল। তাঁ'র গোপন অভিপ্রায় বিলাসের সাথে কন্যা বন্দনার বিবাহ দেওয়া।

কথাটাও এক সময় তিনি বিলাসের পিতার সঙ্গে ক'য়ে রেখেছিলেন। বন্ধুর এটুকু উপকার করতে বিলাসের পিতারও কোন আপত্তি ছিল না—বন্দনাকে তিনি গৃহে নিশ্চয়ই নেবেন বোলে বেণীবাবুকে আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জীবদ্দশায় বন্ধুর এ উপকার তিনি কোরে যেতে পারেননি; তবে পুত্রকে এ জন্য অনুরোধ কোরে গেছেন।

পিতার মৃত্যুতে বিলাস কোন' দুঃখ প্রকাশ ক'রলে না। পরন্তু পিতার সঞ্চিত প্রভূত সম্পত্তি লাভে সে যথেষ্ট আনন্দই লাভ করে। একে অল্প বয়সে সঙ্গ দোষে প'ড়ে তা'র চরিত্র দূষিত হয়, তার উপর পিতার মৃত্যুতে সহসা অগাধ সম্পদের মালিক হ'য়ে সে উচ্ছৃঙ্খলতার চরম সীমায় পৌঁছাল।

তা'র ভবিষ্যৎ চেয়ে দুঃখ করবার মত সংসারে কেউ তেমন ছিল না। পিতার পূর্ব্বেই তা'র জননীর মৃত্যু হ'য়েছিল। সংসারে মাত্র কয়েকটি দূর সম্পর্কের দরিদ্র আত্মীয়া ছাড়া আর কেউ ছিল না। সুতরাং তা'র অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা কোন বাধা পায়নি। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, গণিকাদের গৃহে এবং শুঁড়ীর দোকানের সিন্দুকে পিতার যত্নোপার্জ্জিত অধিকাংশ অর্থ চাবী বন্ধ হ'য়ে পড়েছে....

যখন সে বুঝলে, এভাবে অর্থক্ষয় করলে আর মাস কয়েকের ভিতরই তা'র ভাণ্ডার শূন্য হ'য়ে যাবে, তখন সে নিজেকে কতকটা সংযত কোরে নেয়, এবং পিতার অনুরোধ স্মরণ কোরে, সংসারী হবার মানসে কলিকাতায় ফিরে বেণীবাবুদের সাথে সাক্ষাৎ করে।—সে আজ তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা।

বন্দনা সে বৎসর সবে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হ'য়েছে। বিলাসের সন্দেহ ছিল যে, পাত্রী হয়ত' তা'র পছন্দ হবে না, কিন্তু বন্দনাকে দেখে সে সন্দেহ তা'র ভেঙ্গে যায়।

বন্দনার এই ছিপ্‌ছিপে গঠনের অতি বাদু গোছের মুখকটিকে দেখে ও তা'র উচ্চ শিক্ষার পরিচয় পেয়ে বিশেষরূপ আকৃষ্ট হয়। লোকে কথায় বলে, 'প্রথম দর্শনে প্রেম'! কথাটা এখানে বেশ খাপ খেয়েছিল। বিলাস

এবং বন্দনা পরস্পর পরস্পারের প্রতি প্রথম হ'তেই কেমন একটা প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে।—একে অবশ্য ভবিতব্যও বলা যেতে পারে।

বিলাস আসার পর একথাটা সকলের কাছে ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে যে, বেণীবাবুর অভিলাষ বিলাসের হস্তেই বন্দনাকে সমর্পণ করা। এমন কি, বন্দনারও কথাটা জানতে বাকী রইল না। ফলে অল্প কয়দিনের মধ্যেই সে তা'র ভবিষ্য জীবন দেবতার জন্য অন্তরে অনেকখানি আসন বিস্তার কোরে ফেল্‌লো।

একটা কথা—বিলাস এখানে নিজের সত্য শিক্ষা গোপন কোরে, নিজেকে এম, এ, বোলে পরিচয় দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, কিছুদিন সে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে প্রোফেসরি করে, এমন মিথ্যা প্রচার করতেও তা'র বাধেনি। তা'র মন্দ চরিত্রটার কথাও এখানে কারো জানা নেই—জানবার কোন প্রয়োজন আছে বোলেও কেউ মনে করে না। যতটা জানা গিয়েছে তাই যথেষ্ট।

বেণীবাবু তাঁ'র সর্ব্বগুনালঙ্কৃত ভাবী জামাতাটীকে দেখেন আর ভাবেন, এমন ছেলে হয় না—ভূ'ভারতে এর জোড়া নেই! এখন ভালয় ভালয় কন্যাটীকে তা'র হাতে দিতে পারলেই যেন তিনি নিশ্চিন্ত হন। নিশ্চিন্ত এতদিন হয়ত' তিনি হ'তেও পারতেন, কিন্তু বিলাস তাঁ'কে অনুরোধ কোরে বলে, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে। কারণ তা'র স্ত্রী যে হবে, অন্ততঃ সে বি, এ পাশ হওয়া চাই, নইলে বন্ধু মহলে তা'র মান থাকবে না। অগত্যা বন্দনা বি, এ পাশ না করা পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখতে বেণীবাবু বাধ্য হন।……

এক শ্রেণীর লোক আছে, যাদের পেটে ডুবরী নামিয়েও বর্ণপরিচয়ের

প্রথম অক্ষর টেনে বার করা সম্ভব হয় না, অথচ তাদের মুখের তোড়ে দাঁড়ায় কার সাধ্য! আবার কতক লোক আছে, যাদের ভাতের হাঁড়ীতে ছুঁচো ইঁদুরে ঘর কন্না পেতেছে—অন্ন জোটে না—বাইরে তাদের সাজের ঘটা দেখে কে! তাদের নবাবী দেখে লোকে ঠাওরায় মস্ত কিছু!

অবশ্য বর্ণিত দুই প্রকার অবস্থার কোনটির সাথেই বিলাসের তুলনা হয় না; যে হেতু সে দরিদ্রও নয়, অশিক্ষিতও নয়।—পিতা তাঁর জন্য যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে গেছেন, এবং শিক্ষার দিক দিয়েও সে বি, এ, পাশ তবে তাঁর স্বভাবের মধ্যে এ গুণটী পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান আছে যে, প্রকৃত তাঁর যা আছে বাহিরে প্রকাশ করে তার অনেক বেশী, আর যতটুকু সে জানে তার চেয়ে বেশী লোককে জানায়।

তর্কে সে 'সিদ্ধহস্ত', বড় বড় কথা তাঁর ওষ্ঠাগ্রে লেগে আছে। লোককে হেয় প্রতিপন্ন করায় তাঁর যত আনন্দ তত আনন্দ আর কিছুতে নেই। প্রতি পদক্ষেপে লোককে সে জানিয়ে দিতে চায় যে, সে একটা কেওকেটা নয়, সকলার তাঁকে সম্মান কোরে চলা উচিৎ। তাঁর প্রশংসা না কোরে থেকে ওঠা বাধা, অন্ততঃ পরিচিতদের মধ্যে।

বেলাবাবুর গৃহে কেবল সুরেশ্বর ছাড়া আর সকলেই তাঁর বড় বড় কথায় মুগ্ধ হয়ে অল্পদিনেই আনন্দের সঙ্গে তাঁর প্রাধান্য মেনে নিয়েছিল।

আরো এক ব্যক্তি তাঁর প্রাধান্য স্বীকার কোরে নেয়নি। অধিকন্তু এই দাম্ভিক প্রকৃতির যুবকটীর কথায় কথায় যুক্তিহীন তর্ক শুনে ও

হাবভাব দেখে সে মনে মনে হাসে। বলা বাহুল্য সে ব্যক্তি অপর কেউ নয়, সে অলক।

প্রথম দর্শনেই বিলাসের দৌড় কতদূর তা' অলক ধ'রে ফেলেছিল। বিলাস যে মস্ত বড় ধাপ্পাবাজ ছাড়া আর কিছুই নয়—বড় বড় বাজে বুকনী ব্যতীত কিছুই তা'র জানা নেই—জ্ঞান ভাণ্ডার সম্পূর্ণ শূন্য, এ কথাটা অলকের অভিজ্ঞতার কাছে ধরা পড়তে দেরী হয়নি। প্রফেসরী করবার মত কোন যোগ্যতা যে তা'র নেই এবং ইউনিভারসিটির তরফ হ'তে যতটা সম্মান সত্যই সে পেয়েছে তা শুধু ফাঁকির উপর আর ভাগ্যের জোরে, এটা অলক তা'কে দেখেই বুঝেছিল। অলক অবশ্য ওটুকু সৌভাগ্য হ'তেও নিজে বঞ্চিত; কেন-না কেবল মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষার মানপত্র ছাড়া আর কোন সম্মানই সে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হ'তে পায়নি—তা' সে যে কারনেই হোক্। কিন্তু তাই বোলে তা'র পাণ্ডিত্য বড় অল্প ছিল না।

বাল্যকাল থেকেই জ্ঞানোপার্জ্জন করার একটা প্রবল বাসনা সে মনে মনে পোষণ করত'। ভাগ্যক্রমে যখন তা'কে লেখা পড়া ছাড়তে বাধ্য হ'তে হয়, তখন সে প্রথমটা দুঃখিত খুবই হয়েছিল। তবে দুঃখিত হ'লেও সে নিরাশ বা নিরস্ত হয়'নি। সে তখন ভেবে নিয়েছিল, তা'র কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসর সময়টা জ্ঞানচর্চ্চায় ব্যয়িত করবে। নাই বা পেলো সে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান—জ্ঞান পিপাসা তাতে তা'র মিটবে ত'!

সেই চিন্তাকে কার্য্যে পরিণত কোরে এই দীর্ঘকাল অক্লান্ত বাসনা জড়িত চেষ্টার দ্বারা সে যা লাভ কোরেছে তা' কোন বি. এ; কি এম. এ

কার্য্যকরী হ'ত না। বন্দনার মত নারী এবং বেণীবাবুর মত পুরুষের অন্তরই সে জয় করতে পারত।...

বিলাসকে মালতীর বড় ভাল লেগেছিল—হয়ত' বা দোসর মিল্‌লো বোলে! এতদিন মালতী একা যে কাজটা কোরে উঠতে পারেনি, বিলাস আসার পর অল্প সময়ের মধ্যে দুজনে এক মত হ'য়ে সেটা নিষ্পন্ন কোরে ফেল্‌লে।—

একদিকে মালতী, অপর দিকে বিলাস দিবারাত্র বেণীবাবু ও বন্দনার কর্ণে অলকের বিরুদ্ধে মন্ত্রনা দিয়ে দিয়ে উভয়ের মন হ'তে তা'কে অনেকখানি সরিয়ে দিলে।

সুরেশ্বরীর 'পরেও সে মন্ত্রণা কিছুদিন বর্ষিত হয়েছিল; তবে তা'র কাছে সে মন্ত্রণা কোন সুফল প্রসব করতে না পেরে অবশেষে নিরস্ত হয়। আর সুরেশ্বরীর সম্পর্কে ছায়া, তা'র কথা ত' এখানে ধর্ত্তব্যই নয়। তবুও তা'র পরেও হয়ত' চেষ্টা চলত, কিন্তু যেদিন হ'তে তা'র কাণে অলকের অমর্য্যাদার কথা পৌঁছেচে সেদিন হ'তে এ গৃহে আগমন তা'র বন্ধ হ'য়ে গেছে।—

সে আর আসে না।

(১৭)

স্নেহের পাত্র পাত্রীর কাছ হ'তে যদি সামান্য একটু অবহেলা পাওয়া যায় তাহ'লেই প্রাণটা অভিমানে ভ'রে ওঠে। অলকেরও তাই হ'ল। তা'র অতি স্নেহের পাত্রী বন্দনার কাছ হ'তে আশাতীত ভাবে দিনের পর দিন নিদারুণ অবহেলা পেয়ে পেয়ে সে যেন ক্রমে উন্মত্তের মত হ'য়ে উঠল। সে কি করবে ভেবে পায় না। মরুময় জীবনের দাহ তা'র যেন অসহ্য হ'য়ে উঠল।

অদৃষ্টের এ কি পরিহাস!—কোন অপরাধে ভগবান তা'র জীবনটাকে এমনি কোরে নিষ্ফল কোরে দিচ্ছেন, সে ভেবে পায় না। কথায় আছে —'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়!' এও যেন ঠিক তাই। ব্যথাতুর জীবনখানা নিয়ে আজ পর্য্যন্ত যা'র কাছে সে ছুটে গেছে, একটু শান্তিপূর্ণ স্নেহের আশে, তা'র কাছ হ'তেই সে লাভ কোরেছে তীব্র অপমান। যেখানেই সে জীবনের সর্ব্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে প্রার্থনা কোরেছে একটু ভালবাসা, সেখানেই বিনিময় তা'র মিলেছে শুধু হতাদর; —সেখান হ'তেই সে ফিরেছে বাণ বিদ্ধ বিহঙ্গের মত বিক্ষত অন্তরখানা চেপে ধরে! এই দীর্ঘকাল উদ্‌ভ্রান্তের মত মরীচিকার পাছে পাছে ছুটে আজ সে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! নৈরাশ্য পূর্ণ জীবনখানার 'পরে তা'র এসেছে মহা বিতৃষ্ণা।

আজ তা'র বড় বেশী কোরে [redacted]ড়ে জননী'র কথা। হায়! বন্দনা যদি তা'র সত্যিকারের 'মা' হ'ত তাহ'লে কি সে তা'র প্রতি আজ এমন নিষ্ঠুরা হ'তে পারত? পারত না। তা'হলে সে তা'র ব্যথা বুঝত'। বিশ্বজোড়া প্রাণখানা বুকে কোরে তা'কে আর কাঁদতে হত না। বেদনার গুরু ভারে তা'র বুকখানা তাহ'লে এমন কোরে ভেঙে পড়ত না।

জীবনে অনেক ব্যথা সে পেয়েছে। অনেক অনাদর,—অনেকের দেওয়া লাঞ্ছনা, অপমান, অখ্যাতি সে বুক পেতে নিয়েছে। যদিও সে সব বেদনার কঠিন কষাঘাত তা'র হৃদয় তন্ত্র চূর্ণ কোরে দিয়েছে, তবুও সে সহ্য কোরেছিল;—কিন্তু এ বেদনা সহ্য করা তা'র অসম্ভব হ'য়ে উঠল, যে বেদনা অপ্রত্যাশিত রূপে বন্দনা তা'কে দিলে। সে বেদনার তীব্রতা বোধ করবার জন্য তা'কে এখন তা'র জীবনের সব চেয়ে ঘৃণার সামগ্রী যা', সেই মদের আশ্রয় নিতে হ'য়েছে। সে এখন মদ খায়। একদিন মদ্যপায়ীদের কত নিন্দাই সে নিজে কোরেছে; বোলেছে,—"যারা মাতাল তাদের মনুষ্যত্ব নেই।" আর এখন সে নিজেই সর্ব্বদা মাতাল হয়ে থাকতে চায়! এখন সে বুঝেছে, কেন লোকে মদ খায়—কেন মাতাল হয়!

সে আজ লোক চক্ষে ঘৃণ্য, মাতাল—বন্দনা পর্য্যন্ত তা'কে ঘৃণা করে। কিন্তু কেন সে মাতাল হ'য়েছে—কার জন্য? এর জন্য বন্দনাই কি দায়ী নয়?…

আজ তা'র যখন তখন মনে পড়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা। সে ভাবে, সেই বন্দনা;—যা'কে দেখে একদিন তা'র সর্ব্বহারা প্রাণ আনন্দে নৃত্য কোরে উঠেছিল—যা'কে বালিকা দেখেও সে মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠ আসন

দিয়ে নিজের জীবনকে ধন্য মনে কোরেছিল! যা'র মুখে একটু তৃপ্তির হাসি দেখবার জন্য নিজের সর্ব্বস্ব তা'র বিসর্জ্জিত হ'য়েছে—একটু স্নেহের কামনায় যা'র পায়ের তলে সে সমস্ত বুকখানা নিঙড়ে দিয়েছে—এ সেই বন্দনা!

সে ত' এমন কিছু দাবী জানায়নি বন্দনাকে! সর্ব্বস্বের বিনিময়ে সে শুধু তা'র কাছে চেয়েছিল একটু স্নেহ—মনের কোনে একটু স্থান। তা দিতেও বন্দনার বাধল? আর তা'র পিতা বেণীবাবুর'ও—

সে আর ভাবতে পারে না। বন্দনা এবং বেণীবাবুর কথা সে যতই চিন্তা করে তত আরো ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে।

উঃ! কি নির্ম্মম বিনিময়ই তাদের কাছে সে পেলো।

০ ০ ০ ০

বেণীবাবুকে ঋণ মুক্ত করতে অলক আজ সর্ব্বহারা, কপর্দ্দক শূন্য। তবু এতেও সে এতদিন কাতর হয়নি। ভেবেছিল বাইরের শূন্যতা এলেও অন্তর তা'র পূর্ণ আছে বন্দনা এবং বেণীবাবুর স্নেহে। কিন্তু এটুকুও যখন সে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেল্‌লে, তখন চারিধার তা'র মহাশূন্যতায় ছেয়ে গেছে।

ইতিমধ্যেই বাসা তা'কে তুলে দিতে হ'য়েছে। আসবাব-পত্র সমস্তই বিক্রী হয়ে গেছে। কেবল প্রাণ ধরে তা'র প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বইগুলি সে বিক্রী করতে পারেনি—সেগুলি রেখে এসেছে ছায়ার বাড়ীতে। বাকী আর সে কিছু রাখেনি—চাকর, ঝি, রাঁধুনী সকলকেই সে একে একে বিদায় দিয়েছে। এখন যেখানে সে থাকে, সেখানে থাকবার কল্পনাও সে কোন' দিন করতে পারেনি—

সে থাকে সহরের এক প্রান্তে অবস্থিত এক বস্তির মধ্যে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে। কে জানত,—ভালবাসার কামনায় সর্ব্বস্ব হারিয়ে তা'কে আজ এখন নোংরা বস্তির মধ্যে বাসা বাঁধতে হবে। আজ সে পথের ফকির। আজ তা'র সম্বল সুধু বেণীবাবুর স্বাক্ষরিত কয়েক খানি হ্যাণ্ডনোট।

তা'র এই দুরবস্থার কথা মাত্র সুরেশ্বরী এবং ছায়া ব্যতীত আর কারো কর্ণে পৌঁছায়নি। তা'র কথা জানবার প্রয়োজনও আর কারো আজ নেই।

বেণীবাবুর গৃহে এখন সে আর বড় একটা যায় না। কচিৎ কখনো যদি মনের ঔৎসুক্য দমন করা অসম্ভব হ'য়ে ওঠে, তবেই মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্য একবার গিয়ে সে বন্দনাকে দেখে আসে।

সুরেশ্বরী বহুবার চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে এতেও তা'কে বাধা দিয়ে বোলেছে,

—"কেন ভাই সুধু সুধু অপমান সইতে আসো—আর এসো না। মনে কোরো তোমার বন্দনা হারিয়ে গেছে।"…

উত্তরে অলক সুধু ম্লান হাসি একটু হেসেছে, কথা বলেনি।

প্রায় মাস দুই হ'ল অলক বন্দনাদের বাড়ী যায়নি। চেষ্টা কোরেই মনের ব্যাকুলতা সে এই দুই মাস দমন কোরে রেখেছিল। কিন্তু সেদিন আর পারলে না, বন্দনাকে একটিবার দেখবার জন্য তা'র মন অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠল। তাই ব্যথাদগ্ধ মনটাকে টেনে নিয়ে সেদিন দু' মাস পরে আবার সে তাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল।—

……তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। একটি কক্ষের মধ্যে ব'সে বেণীবাবু

বন্দনা এবং বিলাস খোস গল্প করছিল। সুরেশ্বরী অন্যত্রে কর্ম্মব্যস্ত ছিল—মালতীও তাই।

অলককে দেখে বেণীবাবু বোলে উঠলেন,—"আরে, কে···অলক যে! খবর কি? এ্যাদ্দিন ছিলে কোথায় হে?"

বিলাসের সাথে বন্দনার একবার অর্থ-পূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় হ'ল।

অলক বল্লে,—"থাক্‌ব আর কোথায়,—এই সহরেই ছিলাম।"

বেণীবাবু স্নেহের পরিবর্ত্তে অলকের প্রতি যে ব্যবহার আজকাল করেন, সেটাকে 'ভয়ে ভক্তি' গোছের একটা কিছু বলা চলে। কারণ তিনি জানেন, তাঁ'র মান সম্ভ্রম সমস্ত কিছুই এখন অলকের হাতে। সে ইচ্ছা করলে তাঁ'কে এখন রাস্তায় দাঁড় করাতেও পারে।

অলকের কাছ হ'তে তিনি যা' সাহায্য পেয়েছেন, তা' যে আর কারো কাছে পাবেন না সেটা বুঝতে তাঁ'র বাকী নেই। কাজে কাজেই অন্তর হ'তে না হ'লেও মৌখিক আলাপে তিনি অলককে সন্তুষ্ট রাখতে একটু চেষ্টা করেন। তিনি অলকের উত্তর শুনে বল্লেন,

—"তা এদিকে ত' আর মোটেই আসো টাসো না হে; ব্যাপার কি?"

—"ব্যাপার আর কি,—কিছুই নয়।"...অলকের মুখে একটু করুণ হাসি রেখাপাত করল।

তা'র হাসি লক্ষ্য কোরে বেণীবাবু বল্লেন,—"হাসলে যে?"

—"না এম্‌নি। একটা গল্প মনে প'ড়ে গেল তাই।"···বলতে বলতে অলক কক্ষ মধ্যে প্রবেশ কোরে স্বতন্ত্রভাবে এক পার্শ্বে বসল।

বেণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি গল্প? বলতে আপত্তি আছে?"

—"মোটেই না।"...

পুনরায় একটু হেসে বেণীবাবুর পানে তাকিয়ে অলক বল্লে'—"গল্পটা বিশেষ কিছু নয়,—এক সময় এক ভিক্ষুক কোন' গৃহস্থের দ্বারে এসে এক মুষ্টি ভিক্ষা প্রার্থনা করে। গৃহস্বামী ভিখারীর আবেদন শুনে প্রথমটা ভিক্ষা দেওয়াই মনস্থ করেন; কিন্তু পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তাঁ'র সে ইচ্ছায় বাধা দিলে। ফলে ভিক্ষা দেওয়ার পরিবর্ত্তে তিনি ভিখারীর ভিক্ষা-পাত্রটি পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে তা'কে প্রহারে জর্জ্জরিত কোরে, চোর, জোচ্চোর ইত্যাদি নানা আখ্যায় বিভূষিত কোরে তাড়িয়ে দেন। ভিক্ষুক চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে যখন বিদায় হ'চ্ছে, তখন গৃহস্বামী তা'র পানে চেয়ে জিগেস করলেন,—"ব্যাটা আবার কাঁদ্‌ছিস্ কেন্ রে? খেটে খেতে পারিস না? দোষ কোরে আবার কান্না!'—আমি তাই ভাবছি সত্যিকার অপরাধী কে? ঐ ভিক্ষুক, না গৃহস্বামী?—কথাটা হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল তাই হাস্‌লুম।"

অলকের কথা শেষ হ'তেই বিলাস বল্লে,—"অলকবাবু কি আজকাল দার্শনিক হবার চেষ্টা করছেন নাকি? আপনার এ অপ্রাসঙ্গিক উক্তির ত' কোন হেতু ছিল না এখানে।"

অলক বল্লে,—"সব কিছুই চেষ্টা কোরে হওয়া যায় না বিলাসবাবু, অভিজ্ঞতায় মানুষ গ'ড়ে ওঠে। কথাটা হয়ত' আমার অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু আবার নাও হ'তে পারে ত'?"

বিলাস একটু বিদ্রূপের হাসি হাস্‌লে, কোন কথা বললে না।

অলকের গলা শুন্‌তে পেয়ে সুরেশ্বরী এতক্ষণ সেখানে এসে গিয়েছিল। তা'র সাথে আঁখি বিনিময় হ'তেই অলকের ওষ্ঠে ফুটে উঠল

পূর্ব্ববৎ একটু ম্লান হাসির টুক্‌রা। অলকের কথিত গল্পটি সকলের নিকট অপ্রাসঙ্গিক বোলে মনে হ'লেও সুরেশ্বরীর কাছে হয়নি। তাই অলক তা'র পানে তাকাতেই সে তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে অশ্রু দমনের চেষ্টা করলে।

বেণীবাবু সহসা বোলে উঠলেন,—"হ্যাঁ ভালো কথা! কাল একটু দরকারে একবার ছায়ার বাড়ী গেছলুম। শুনলুম, তুমি নাকি বাসা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথায় উঠে গেছ—আসবাব-টাসবাব সব বিক্রি কোরে দিয়েছ—একি সত্যি অলক?"

অলক বল্লে,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যি।"

বিস্মিত কণ্ঠে বেণীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন অলক?"

—"অবস্থার পীড়নে মানুষকে সব কিছুই করতে হয়। আমাকেও হ'য়েছে। যতদিন অবস্থা ছিল, ততদিন সব কিছুই ছিল। এখন সে অবস্থাও গেল, সঙ্গে সঙ্গে সবই গেল।"

—"এর কারণ?"

—"কারণ, ষাট টাকা বাড়ী ভাড়া দিয়ে থাকবার মত আমার আর অবস্থা নেই।"

—"কেন? তোমার ত' ব্যাঙ্কে শুনেছি প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ-হাজার টাকা জমা ছিল? অত' টাকা কি করলে?"

অলক একটু হাসলে। এ হাসির অর্থ একমাত্র সুরেশ্বরীই বুঝলে। এতদিন বেণীবাবুর প্রয়োজন মেটাতে যা' টাকা অলক তাঁ'কে দিয়েছে, তা' ঐ চল্লিশ-পঞ্চাশ-হাজারের চেয়ে কিছু কম নয়, বরং বেশীই।

বিলাস বন্দনার কাণে কাণে কি একটা মন্তব্য প্রকাশ করলে। বন্দনার মুখে একটা ঘৃণার ভাব স্পষ্ট ফুটে উঠল।

অলকের দৃষ্টিতে তা' এড়িয়ে গেল না। তা'র মুখে আবার সেই গর্ব্বের হাসি। এতক্ষণ অলকের পরিহিত ছিন্ন বস্ত্রাদির প্রতি কারো দৃষ্টি পড়েনি; এবারে তার দিকে সকলারই নজর পড়ল।

বেণীবাবু তা'কে নিরুত্তর দেখে এবং তা'র শত ছিন্ন বস্ত্রাদির প্রতি লক্ষ্য কোরে বল্লেন,

—"না, না সত্যি অলক! অত' টাকা তোমার কি হ'ল? তোমাকে কখনো এ রকম বেশে দেখব বোলে আশা করিনি! ব্যাপার কি বলত'?"

—"ব্যাপার আর কি,—কিছুই নয়।"···অলক নীরবে বসে রইল, আর কিছু বল্লে না। সুরেশ্বরী সকলের অলক্ষ্যে অশ্রুসিক্ত চক্ষুদুটি একবার মুছে নিলে। বন্দনারও চক্ষে কেমন একটু অশ্রু দেখা গেল। হয়ত' সমবেদনা তা'রও বুকে একটু আঘাত হানলে। হয়ত' বাইরের পারিপার্শ্বিক উষ্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে এখনো সে চেষ্টা কোরেও নিজের মনটাকে তৈরী কোরে নিতে পারেনি। হয়ত' মনের কোণে এখনো মাঝে মাঝে নির্য্যাতিত অলকের ক্ষীণ স্নেহ স্মৃতিটুকু পূর্ব্বের আকারে মাথা তুলে দাঁড়ায়! সম্ভবতঃ তাই আজ অতি বাবু অলকের দশা দেখে তা'রও চক্ষে অশ্রু দেখা দিলে। তবে নিজেকে সামলে নিতেও তা'র দেরী হ'ল না।

সর্ব্ব বিষয়ে কথা বলা এবং সকলার উপর মাষ্টারি করতে যাওয়া বিলাসের একটা বিশেষ রোগ। তাই বেণীবাবু এবং অলকের কথাবার্ত্তা

শুনে ও ভাব ভঙ্গী লক্ষ্য কোরে সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না। গম্ভীরভাবে সে বোলে বসল,

—"বাস্তবিক, অলক বাবুর এ অধঃপতন কল্পনা করা যায়নি! আমিও ত' পূর্ব্বে দেখেছি, অলক বাবুর সেই, ওর নাম কি—কাপ্তেনী!—এমনিই হয়......অভিভাবক হীন ছেলে-পিলেদের হাতে পয়সা কড়ী পড়লে অধিকাংশ স্থলেই ওর নাম কি, এই রকম দশা হ'য়ে থাকে। আশ্চর্য্য হবার এতে অবিশ্যি কিছু তেমন নেই।"

রাগে অলকের চোখ দুটো একবার লাল হ'য়ে উঠল। পরক্ষণে সে অভাবনীয় ভাবে উচ্চহাস্য কোরে বোলে উঠল,

"ঠিক কথাই বোলেছেন বিলাসবাবু; নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে খাঁটী কথাটাই ধ'রে ফেলেছেন!"...

অলক তা'র পানে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

তা'র কথায় কর্ণপাত না কোরে বিলাস উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বল্লে,

—"না, না হাসির কথা নয়, সত্যি!—আমি ত' আজ পর্য্যন্ত অনেক ছেলেই দেখলুম। ওর নাম কি, বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটিতে যখন আমি প্রথম প্রফেসারী করতে—"

হঠাৎ তা'কে বাধা দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে অলক বোলে উঠল,

—"থামুন, আর বেশী বাড়াবেন না, যথেষ্ট হ'য়েছে। মিথ্যার আড়ম্বরে নিজেকে সাজিয়ে লোক সমাজে বেশীদিন থাকা চলে না—সত্যটা চিরদিন অপ্রকাশ থাকে না। মিথ্যাটা ততদিনই ভালো লাগে যতদিন সত্য থাকে দূরে; বুঝেছেন?"

—"মানে? আপনার হেঁয়ালীর অর্থ ত' কিছুই বোধগম্য হ'ল না।"

—"বোধগম্য ঠিকই হ'য়েছে, তবে প্রকাশের বাধা আছে। কিন্তু ও কথা থাক্! এখন একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, বলুন ত'—আমার সম্বন্ধে যে মন্তব্যটা আপনি প্রকাশ করলেন সেটা কি ভেবে এবং কোন্ অধিকারে?"

অলকের কঠিন কণ্ঠে বিলাস নিজকে একটু বিপন্ন বোধ করলে। কি উত্তর দেবে সে ভেবে পেলে না। একবার বেণীবাবুর পানে, একবার বন্দনার পানে সে উত্তর অন্বেষণের জন্য তাকাতে লাগলো। তা'র এ অবস্থা দেখে বন্দনাই তা'র হ'য়ে উত্তরটা দিয়ে দিলে। অলকের পানে তাকিয়ে বেশ কড়া সুরেই বন্দনা বল্লে,

—"পাপীকে পাপী বলবার অধিকার সকলেরই আছে।"

বন্দনার আশাতীত উক্তিতে অলক স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। কিছুক্ষণ কোন কথা বল্‌তে পারলে না। একবার ভাবলে, উঠে চলে যাবে, কিন্তু পরক্ষণে কি ভেবে সে বন্দনাকে বল্লে,

—"হ্যাঁ, সে কথা ঠিকই—পাপীকে পাপী বলার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু..."

অলক মুহূর্ত্ত কাল কি চিন্তা কোরে পুনরায় বল্লে,

—"কিন্তু মা, পাপীর বিষয় কিছু বলার পূর্ব্বে সকলেরই নিজের বিষয় একটু ভেবে দেখা উচিৎ। আমি অসচ্চরিত্র, মাতাল সে কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু বিলাসবাবু যে বল্লেন, 'অভিভাবক হীন ছেলে-পিলেদের হাতে পয়সা কড়ি পড়লে এই দশাই হ'য়ে থাকে'! তার উত্তরে আমি শুধু ওঁকে এইটুকু জানিয়ে দিতে চাই যে, ওঁর মত বাপ ঠাকুর্দ্দার সঞ্চিত পয়সা নষ্ট কোরে আমি কোনদিন কাপ্তেনী করিনি। আমি যা'

নষ্ট কোরেছি—ভালোতেই হোক্ বা মন্দতেই হোক্—সেটা আমার নিজের উপার্জ্জনের পয়সা। কাজেই এ বিষয় আমি কারো মন্তব্য শুন্‌তে বাধ্য নই, এবং মন্তব্য প্রকাশের অধিকারও কারো নেই। আর অভিভাবক আমার কোনকালেই ছিল না। পনেরো বছর বয়সে অপমানিত হ'য়ে কাকার বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসি, মায়ের হাত ধ'রে। তারপর থেকে নিজের উপায়েই যা' কিছু কোরেছি। আমার নিজের রক্ষক চিরকালই আমি নিজে।"

বন্দনা বল্লে,—"তা' হ'তে পারে, কিন্তু দোষীর দোষ দেখিয়ে দেবার অধিকার সকলের আছে।"

—"তা' আছে। তবে দোষ যিনি দেখাবেন তাঁ'কে অন্তত রীতিমত খাঁটী হওয়া চাই। এই কারণেই কবি লিখেছেন,—

'ধর্ম্মান্ধরা শোনো'

অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজেদের পাপ গোণো!'

সুতরাং নিজে যে দোষী অপরের দোষের বিচার করা তা'র কোন মতেই উচিৎ নয়। কতকগুলো লোক আছে যা'রা নিজের সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা পায় এবং নিজের প্রকৃত জ্ঞান, বিদ্যা, চরিত্র গোপন কোরে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ছলনায় লোককে বশ করে। নিজেদের গলদগুলো ঢাকবার জন্যে তা'রা সর্ব্বদা বাইরের কতকগুলো ছদ্ম আবরণ টেনে আনে। আবার তা'রাই বেশী কোরে বিচার করে লোকের দোষ গুণ।"

বন্দনা তীক্ষ্ণ স্বরে বল্লে

—"ও কথাটা এখানে ঠিক খাপ খেলো না; কারণ ও রকম লোক এখানে কেউ নেই।"

অলক বল্লে,—"থাকলেও চেনা শক্ত।"

অলকের কথা শুনে বিলাসের মুখখানা যেন সাদা হ'য়ে গেল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বল্লে,

—"অলকবাবু, অনেকগুলো বড় বড় কথা শিখেছেন, কিন্তু ওর নাম কি, সেগুলোর প্রয়োগ বিধি এখনো শিখতে পারেন নি।"

—"আজ্ঞে না। সেগুলো এবার আপনার কাছে শিখে নেব।"

—"নেওয়া উচিৎ!"...বিলাস গর্ব্বিত ভাবে বল্লে।

—"নিশ্চয়ই! আপনার মত একজন প্রফেসরের কাছে শিক্ষা পাওয়া ভাগ্যের কথা ত' বটেই!"......

অলক তা'র পানে চেয়ে হাসতে লাগলো।

বিলাস তা'র কথার ও হাসির অর্থ ঠিক বুঝলে না। সে বোকার মত তা'র পানে তাকিয়ে রইল।

অলক বল্লে,—"দেখুন বিলাসবাবু! ঠকাতে গেলেই নিজেকে ঠক্‌তে হবে! সত্যকে চিরদিন ঢেকে রাখতে পারবেন্ না।"

—"তার মানে?"

—"মানেটা নিজের মনে সন্ধান করলেই মিলে যাবে। আপনাকে আমি উপদেশ দিতে চাই না, আর আমার সে স্বভাবও নয়। তবু আপনার ভালোর জন্যেই আপনাকে একটু সাবধান কোরে দিচ্ছি, যেটা করবেন বা বলবেন একটু বুঝে, নচেৎ ঠক্‌তে হবে। মিথ্যের ইমারৎ বেশীদিন থাকে না। জীবনের এখন আপনার অনেক বাকী। সেইজন্যে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, একটু বুঝে চলবেন। আমার জীবনে অনেক শিক্ষা, অনেক কিছু অভিজ্ঞতা লাভ হ'য়েছে; তাই আপনাকে

এই অনুরোধ করলুম। হাজার হ'লেও আপনার চেয়ে ত' আমি অনেক বড়ো।—"

তা'র কথা শেষ হ'তেই বন্দনা ভ্রূকুটি সহকারে বোলে উঠল,

—"বড় সুধু বয়সেই, আর কোন' দিকে নয়।—জ্ঞানে, শিক্ষায়, বুদ্ধিতে, চরিত্রে কোন' দিকেই নয়—অভিজ্ঞতাও বয়স হ'লেই বাড়ে না। বিলাসদা'কে উপদেশ দিতে আসা তোমার শোভা পায় না।"

বন্দনার কথায় সাহস পেয়ে বিলাস এবার চীৎকার কোরে উঠল। চোর যেমন নিজের স্বপক্ষে একজনকে বলতে শুনলে তাড়াতাড়ি নিজের সাফাই গাইবার জন্যে চেঁচিয়ে ওঠে, তেমনি কোরে সে বোলে উঠল,

—"স্পর্দ্ধা দেখেছ! ওর নাম কি, একটা চরিত্রহীন, মাতাল কিনা এসেছে আমাকে উপদেশ দিতে! আমার কাছে অভিজ্ঞতার বড়াই! কতটুকু অভিজ্ঞতা পেয়েছেন আপনি ম'শাই যে একটা উচ্চ শিক্ষিত—ওর নাম কি, একটা প্রফেসারকে আপনি অভিজ্ঞতা দেখাতে আসেন? কতটুকু বিদ্যে আপনার পেটে আছে? idiot, rascal কোথাকার!—"

অলকের এবার নিজেকে সামলান শক্ত হ'য়ে পড়লো। রাগে সমস্ত দেহ তা'র ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপতে লাগলো। তা'র ইচ্ছা হ'তে লাগলো বিলাসের জিভটা টেনে ছিঁড়ে দিতে। অতি কষ্টে আত্মদমন কোরে সে বল্লে,

—"বিলাসবাবু! একটু সংযত হ'য়ে কথা বলবার চেষ্টা করুন্। আপনাকে আমি উপদেশ দিইনি—অনুরোধ কোরেছিলুম। কারণ আপনার স্বরূপ জানতে আমার বাকী নেই। আপনার যে বিদ্যের দৌড় কতদূর এবং আপনি কি চরিত্রের লোক, তা' জানতে অন্ততঃ আমার বাকী

নেই। বাজে কতকগুলো বড় বড় কথা বললেই আর প্রফেসার হওয়া যায় না। ওসব আজগুবী কথায় অন্য লোককে ভুলোবেন, আমাকে নয়।"

—"কি আমার সব আজগুবী কথা—আমি প্রফেসার—"

—"থামুন, থামুন, আর বেশী বাজে বকবেন না। দীনেশবাবুকে চেনেন? আপনার বাবার বন্ধু—যিনি আপনাদের ঐ হিন্দু ইউনিভারসিটির একজন পুরোনো প্রফেসর? তাঁর কাছে আমি আপনার বিষয় সব শুনেছি। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, যদি বেশী বাড়াবাড়ি না করেন তাহ'লে একথা কারো কাছে প্রকাশ হবে না।"

প্রকৃতই কয়েকদিন পূর্ব্বে অলক কোন' চেষ্টা না কোরেই বিলাসের বিষয় অনেক কিছুই জেনে ফেলেছে।

প্রফেসর দীনেশ চৌধুরীর সাথে তা'র অনেক দিনের আলাপ। সেদিন হঠাৎ পথে তাঁ'র সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাওয়ায় কথা প্রসঙ্গে তিনিই বিলাসের কথা তোলেন, এবং সবিস্তারে তা'র সকল গুণাগুণ ব্যাখ্যা করেন।...

দীনেশবাবুর নাম শুনেই বিলাসের চক্ষু একেবারে কপালে ওঠবার উপক্রম হ'ল। জোঁকের মুখে কিঞ্চিৎ লবণ নিক্ষিপ্ত হ'লে তা'র যে অবস্থা হয় বিলাসেরও কতকটা সেই অবস্থা হ'ল। তা'র মুখখানা বিবর্ণ হ'য়ে গেল। তা'র মনে পড়ল কয় বৎসর পূর্ব্বে ঐ দীনেশবাবুরই এক বন্ধু কন্যার প্রতি সে কি ব্যবহার কোরেছিল, যার জন্য তা'কে কম অপমান সহ্য করতে হয়নি! অলকের কথায় এইবার সে রীতিমত ভীত হ'য়ে পড়লো। শুষ্ক ওষ্ঠের উপর বার বার সে জিহ্বা লেহন করতে

লাগলো।...অলক যদি সে সব কথা এখন প্রকাশ কোরে দেয় তাহ'লে ত আর উপায় থাকবে না। তা'র উপস্থিত ছলনা এবং ভবিষ্যতের সমস্ত কল্পনা তাহ'লে এখুনি বিনষ্ট হ'য়ে যাবে। সুন্দরী, শিক্ষিতা বন্দনাকে লাভ করা ত' দূরের কথা, তাহ'লে এ গৃহ হ'তে বহিস্কৃত হ'তেও তা'র দেরী হবে না। তা'র কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুষ্ক হ'য়ে এলো।

বিলাসের ঐ অবস্থা এবং মুখাবয়বের নানা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য কোরে অলক হো-হো শব্দে হেসে উঠলো। তা'র হাস্যে বিলাসের বক্ষস্থল আরো ঘন ঘন কেঁপে উঠতে লাগলো। তা'র পানে চেয়ে সহাস্যে অলক বল্লে,

—"ভয় নেই বিলাসবাবু—আমা হ'তে আপনার কোনও অনিষ্ট হবে না।"......

কথা শেষে সে আসন ত্যাগ কোরে উঠে পড়লো। কক্ষস্থ সকলের পানে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে বল্লে,

—"আচ্ছা, চল্লুম! আপনাদের অনেক জ্বালাতন করলুম, পারেন ত' ক্ষমা করবেন—"

আর অপেক্ষা না কোরে সে ধীরে ধীরে কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'ল।

তা'র গমন পথের পানে বিমূঢ়ের মত বিলাস চেয়ে রইল, কিছু বল্‌তে পারলে না। ঘরের আবহাওয়া প্রগাঢ় স্তব্ধতায় থম্ থম্ করতে লাগলো।

১৮

ঐ ঘটনার পর প্রায় তিন চার মাস কেটে গেল। অলক সেই যে গেছে আর আসে না। তা'র জন্য ব্যস্তও অবশ্য কেউ নয়,—একমাত্র সুরেশ্বরী ছাড়া...

বিলাস মাঝে মাঝে বাহির হ'তে তা'র নানা খবর বহন কোরে আনে এবং সত্যের পরিবর্ত্তে নিজ স্বভাব অনুযায়ী মিথ্যাটা বেশ অলঙ্কারে রঞ্জিত কোরে বন্দনার কাছে প্রকাশ করে।

বন্দনা সে সব শোনে আর ভাবে—উঃ, কি শয়তান! অথচ নিজের চরিত্র গোপন কোরে কেমন একটি ভালো মানুষ সেজেই অলক এতদিন ছিল! আশ্চর্য্য!...

প্রকাশ্যে সে বিলাসের পানে তাকিয়ে বলে,

—"আচ্ছা বিলাসদা'! অলকের কিন্তু বাহাদুরী আছে, কি বল? এতদিন আমাদের সঙ্গে মিশলে, অথচ এতটুকু ধরা ছোঁয়া দেয় নি!—বাস্তবিক আশ্চর্য্যের কথা—যা'র অত বিশ্রী চরিত্র সে কি কোরে অমন ভালোটা সেজে ছিল? আমার মনে হয় ও যদি অভিনয় করত তাহ'লে একজন দক্ষ অভিনেতা হ'তে পারত', কি বল'?"

—"তা পারত'। তবে কি জান বন্দনা, যে লোক যত মন্দ হয়, সে বাইরেটা তত ভালো রাখতে চেষ্টা করে,—লোক ঠাকান তা' নাহ'লে খাবে কি কোরে? আমি কিন্তু তোমাদের ঐ অলককে দেখেই চিনে-

ছিলাম যে ও কি জীব! আমার চোখে ত ধুলো দেওয়া বড় যা' তা' কথা নয়; অমন ঢের অলককে ওর নাম কি আমি চরিয়ে এসেছি।"

মালতীও সময় সময় তাদের আলোচনায় যোগ দিয়ে মুখ ভঙ্গী সহকারে বলে,

—"ওর স্বভাব জানতে আমারো বাকী নেই। আমি মেয়েমানুষ তাই চুপ কোরে থাকি, পেরকাশ করি না। জন্মে ভুলব না বাবা সে রাত্তিরের কথা! এখনো মনে পড়লে যেন ডাক ছেড়ে আমার কাঁদতে ইচ্ছে হয়।..."

উপস্থিত সকলেই তা'র পানে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।

সে বলে,—"সেই যে গো বন্দনা, তোমার মামার একবার খুব অসুখ করে, সেই অনেক দিন আগে! তুমি কত্তার সঙ্গে মামার বাড়ী গেলে: মনে নেই?...সেই তখন। তোমরা যে দিনে যাও সে রাত্তিরে ত' ও ছোঁড়া এখানে ছিল! কে জানত বল মুখপোড়ার মনের কথা—থাকত' ত' দিব্যি ভালমানুষটি সেজে! কি করলে জান?—রাত্তির তখন দুটো, অকাতরে ঘমুচ্চি, হঠাৎ একটা আওয়াজ হ'তেই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। ভাবলুম বুঝি ঘরে বেড়াল-টেড়াল ঢুকেচে! তাড়াতাড়ি উঠে আলোটা জ্বালতেই দেখি—ওমা, পোড়ারমুখো আমার ঘরের ভেতর এসে ঢুকেচে গা!...আমার তখন অবস্থা কি ভাবো—একলা মেয়েমানুষ, কেউ কোথাও নেই। সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ কোরে আমার কাঁপতে লাগলো। পেরথমটা খুব চেঁচিয়ে উঠলুম। কিন্তু শুনবে কে—সবাই ত' তখন ঘুমুচে? ছোঁড়াও নড়ে না, কেরমশ আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সাহস কোরে বললুম,—'খবরদার আমার গায়ে হাত দিস না—হাত ঠুঁটো হয়ে যাবে—

আমি তোর মা!' কিন্তু কে শোনে সে কথা, ও আরো আমার কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো। যখন দেখলুম আর উপায় নেই, আমি যতই সরে যাই ও ততই এগিয়ে আসে। তখন হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। হুঁ, হুঁ বাবা, এ মালী-বামনীর কাছে চালাকী নয়! তাড়াতাড়ি তখন খাটের তলা থেকে ঝ্যাটাটা বার কোরে দিলুম আচ্ছা কোরে ঝালিয়ে বল্লুম,—'মুখপোড়া বেরো শীগ্‌গির।...”

—“তারপর?”

—“তারপর আর কি, বাছাধন পালাতে পথ পান্ না। তাই ত' ওটাকে দেখলেই আমার গা জ্বালা করতে থাকে। তোমরা তখন আমার কথা কানেই নিতে না। ভাবতে, মাগী বুঝি শুধু শুধুই অমন করে! এখন বুঝচো ত'?—”

বিলাস বলে,

—“হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও লোক সব করতে পারে। এই দেখনা, ওর নাম কি, তোমাদের হাতের গোড়াতেই, একটা ভদ্রলোকের মেয়ের—মানে একটা অভিভাবক হীনা বাল-বিধবার সর্ব্বনাশ করবার জন্যে কি রকম ও উঠে প'ড়ে লেগেছে। ওর নাম কি, মেয়েটিও আর ভালো নেই। তোমার বাবার সঙ্গে সেদিন মাণিকতলায় ওর বাড়ীতে গিয়ে ওর নাম কি যা দৃশ্য দেখে এসেছি তাতে ত' চক্ষু স্থির! দেখি না একটা খাটের উপর দু'জনে শুয়ে দিব্যি আরাম কোরে ঘুমুচ্ছে। তোমার বাবা ত' ওর নাম কি, ও দেখে আর দাঁড়াতেই পারলেন না। বাইরে এসে আমায় বল্লেন, 'বিলাস তোমার কথা আর অবিশ্বাস করবার যো নেই।

বাস্তবিকই ! ওর নাম কি, ওদের আর পদার্থ নেই।”........

.. সম্প্রতি বিলাসচন্দ্র অলক সম্বন্ধে আর এক নূতন তথ্য আবিষ্কার কোরে ফেলেছে। ব্যভিচারী অলকের সংসর্গে প'ড়ে আজ কাল নাকি ছায়াও সর্ব্বনাশের পথে অবতীর্ণা বোলে তা'র বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসটাকে সত্য বোলে প্রতিপন্ন করবার জন্য তা'কে নানা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বেণীবাবু, বন্দনা ও মালতীর কাছে ব্যক্ত করতে হয়।

বাক্‌সর্ব্বস্ব বিলাসচন্দ্রের মিথ্যা বলার অদ্ভুত নৈপুণ্যে অধুনা তা'র সর্ব্ব কথায় বিশ্বাসী ও মুগ্ধ প্রাণীগণের প্রাণেও একথাটা স্পষ্ট প্রতীত যে, অলক এবং ছায়ার মধ্যে অবৈধ প্রণয় পর্ব্ব চলেছে। নানা প্রমাণ প্রদর্শনেও বিলাস পরাঙ্মুখ হয়নি। প্রায়ই অলক ও ছায়ার একটা না একটা সংবাদ সে বাহির হ'তে সংগ্রহ কোরে আনে। অবশ্য কাট ছাট দিয়ে দেখলে দেখা যাবে সবটাই তার অসত্য। কিন্তু সেরূপ ভাবে দেখবার মনোবৃত্তি তা'র শ্রোতাদের মধ্যে কারো নাই। সেদিন আবার হাতে হাতে যে প্রমাণ সে বেণীবাবুকে দিয়েছে, তাতে আর কোন মতেই তাদের সম্বন্ধে অবিশ্বাস রাখা চলে না।—

কয়দিন পূর্ব্বে এক মধ্যাহ্নে কি একটা কাজে বেণীবাবুকে একবার মাণিকতলায় যেতে হ'য়েছিল। কাজ সেরে ফেরবার পথে তিনি ছায়ার সাথে একবার সাক্ষাৎ করা উচিৎ বিবেচনা কোরে তা'র বাড়ী যান। সঙ্গে তাঁ'র বিলাস ছিল। তিনি বিলাস সহ যখন ছায়ার গৃহে পৌছান তখন আহারাদি শেষে সকলেই—ঝি, চাকর বামুন ইত্যাদি সবাই বিশ্রাম ব্যস্ত কাউকে বিরক্ত না কোরে তিনি অভ্যাস মত একেবারে ছায়ার কক্ষের দ্বারে

এসে উপস্থিত হ'লেন। কিন্তু সহসা যে শ্লীলতা হানিকর দৃশ্য তাঁর এবং বিলাসের চোখে পড়লো তাতে আর তিলমাত্র সেখানে দাঁড়ান তাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তাঁ'রা দেখেন যে, কক্ষমধ্যে স্থাপিত প্রকাণ্ড খাটখানার 'পরে অলক এবং ছায়া বেশ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাচ্ছে। যদিও সে দৃশ্য এমন কিছু মারাত্মক ছিল না, কারণ উভয়ের মধ্যভাগে অনেকখানি স্থান শূন্য ছিল এবং উভয়েই রীতিমত সাবধানতার সঙ্গে নিদ্রাবিষ্ট ছিল। তথাপি সে দৃশ্য তাঁ'দের রুচিতে বাধে এবং অনেক সন্দেহের কথাই নির্দ্দেশ কোরে দেয়।

......তারপর সেই কথাটা বিলাসের অতি রঞ্জিত কোরে বলার সুন্দর ভঙ্গীতে এমন স্থলে এখন এসে গেছে যে, অলক ও ছায়ার কথা চিন্তা করতেও বিলাসের গুণগ্রাহীদের নাসা কুঞ্চিত হয়।

সুরেশ্বরীর কাণেও যে বিষয়টা না পৌঁছেচে এমন নয়; কিন্তু সে বিশ্বাস ত' করেইনি, উপরন্তু বোলেছে,

—"নিজের চোখে দেখলেও এ অসম্ভব ব্যাপার আমি কখনো বিশ্বাস করব না। ছায়া আমার নিজের ননদ, তা'র সম্বন্ধে আমি যত জানি তত আর কেউ জানতে পারে না। আর অলককে আমি শ্রদ্ধা করি, বয়সে ছোট হ'লেও তা'কে আমি দেবতার মত ভক্তি করি, তা'র দ্বারা এমন নীচ কাজ কখনো হ'তে পারে না—এ কথা আমি জোর কোরে বলতে পারি।"

প্রত্যুত্তরে ঘন ঘন হস্ত আন্দোলন কোরে মালতী বোলেছে,

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার ও দেব্‌তাকে জানতে আমার আর বাকী

নেই গো ঠাকরুণ; তুমি আর ওর বড়াই কোরো না। বলে সে, রাত্তিরে ও আমার পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ করতে এসেছিল, তার খবর কি কেউ রাখে! "—"

নির্ব্বাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তা'র পানে তাকিয়ে থেকে সুরেশ্বরী চীৎকার কোরে ওঠে,

—"বৌদি'! তোমার বল্‌তে একটু বাধল না। তুমি জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াতে পার! তোমার খুরে খুরে নমস্কার। উঃ! সে রাত্তিরের কথা তুমি আবার কোন্ আক্কেলে উচ্চারণ করলে? সে রাত্তিরের লজ্জা যে জলজ্যান্ত আমি এখনো বেঁচে রয়েছি! সুধু বংশের কলঙ্ক রেখে এতদিন প্রকাশ করিনি। তুমি কিনা আবার—উঃ, তোমরা সব করতে পার! তোমাদের আর অস্তিত্ব বোলে কিছু নেই। এখানে থাকলে আমিও দুদিন বাদে আমাকে হারিয়ে ফেলব। কাজ নেই আর আমার ভায়ের ভাত খেয়ে, এর চেয়ে না খেতে পেয়ে শ্বশুরের ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকাও আমার ভালো। তাতে আর কিছু হোক বা না হোক মনুষ্যত্বটুকু বজায় রাখতে পারব।"...

সেইদিনেই হয়ত' ভায়ের বাড়ী হ'তে সুরেশ্বরী বিদায় নিত, কিন্তু সহসা বেণীবাবু অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় সেটা আর ঘোটে ওঠেনি।

(১৯)

বেণীবাবুর ভীষণ অসুখ—বাঁচা সঙ্কট। ডাক্তার মত প্রকাশ কোরেছেন,—"উপযুক্ত সেবা না হ'লে যে কোন' মুহূর্ত্তে রোগীর মৃত্যু আসতে পারে।"

গৃহের সকলেই বিশেষরূপ শঙ্কিত ও চিন্তিত। সুরেশ্বরীর নিশ্বাস ফেলবার পর্য্যন্ত সময় নেই—একদিকে সংসার অন্যদিকে রোগী। এমন একটি লোকও নেই যে তা'র একটু সাহায্যে লাগে। মালতীকে একটা কাজ বললে সে দশটা অকাজ কোরে বসবে। আর বন্দনার কথা ত' ধর্ত্তব্যই নয়,—সে না জানে সংসারের কাজ, না পারে রোগীর সেবা করতে। একমাত্র বৃদ্ধ চাকর বিহারী ছাড়া এমন একটা পুরুষও বাড়ীতে নেই, যার 'পরে নির্ভর করা চলে।

সুরেশ্বরীর প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। একা সে আর পেরে উঠছে না। এদিক দেখতে গেলে ওদিক হয় না, আর ওদিক দেখতে গেলে এদিক হয় না। সে মহা বিভ্রাটে পড়ে গেছে। অথচ ডাক্তার যেরূপ সেবার কথা উল্লেখ কোরেছেন, তাতে একজন শিক্ষিতা সেবিকা কিম্বা ঐরূপ কোন উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন, যে দিনরাত রোগীর পরিচর্য্যা করতে

পারে। কিন্তু সেরূপ লোকও কেউ নেই, আর সেবিকা রাখার মত বেণীবাবুর সামর্থও নয়। কাজেই রোগী ক্রমশঃ মন্দের দিকেই চলেছে। সুরেশ্বরীর সকল শ্রমই ক্রমে ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিলাসের সেবা-টেবা করা ধাতে সয় না। সে তাই এই সময় নানা অছিলায় একবার কোরে বন্দনাকে দেখা দিয়েই অমনি সরে পড়ে। তবে যেটুকু সময় সে আসে সেটুকুর মধ্যেই গৃহবাসীদের অস্থির কোরে তোলে।..."এটা কেন হয়নি, ওটা কেন হয়নি—এমন অবহেলা করলে রোগীকে বাঁচান যাবে না।" ইত্যাদি নানা কথায় সে সকলকে ব্যস্ত কোরে তোলে। বিশেষ কোরে আবার বিহারীর উপরেই তা'র ঝালটা বেশী কোরে বর্ষিত হয়।

সেদিনও অমনি এসে—"বিহারী—বিহারী!" কোরে সে বাড়ী মাথায় কোরে তুললে।

বিলাস লোকটিকে বিহারীরও মোটে পছন্দ নয়। কেন তা' ভগবানই জানেন। তা'র ডাকে সাড়া দিতে বা তা'র সঙ্গে কথা বলতে সে রীতিমত বিরক্ত হয়। কিন্তু উপায় নেই, বাবুর বাড়ীতে থেকে বাবুর অতিথিকে অপমান করবার সাহস তা'র নেই। তাই অনিচ্ছা সত্বেও বিলাসের আদেশ তা'কে শুনতে হয়।

বিলাসের ডাকে সে তা'র সামনে এসে রুক্ষ স্বরে বল্লে,

—"কিগো, অমন বেহারী, বেহারী কোরে চেল্লাচ্চ কেন?"

বিলাস মুখভঙ্গী সহকারে তা'র কথার প্রতিধ্বনি কোরে বল্লে,

—"চেল্লাচ্চ কেন! ব্যাটা চেল্লাব না ত' কি? তোকে যে কাল

বোলে গেলুম আজকে বারটার সময় ডাক্তার বাড়ী যেতে হবে, তা গেছলি? ওর নাম কি, ব্যাটা কুঁড়ের এক শেষ!"

বিহারী বল্লে,—"তা' অমন করো কেন? যাইনি, যাবখুনি। মনিষ্যির শরীল ত' বটেন! চৈপরদিন কাগাড় খাটতি খাটতি বেদ্ধ নোক হেঁপিয়ে উঠি। শরীল বইবে কেন? সেই পেত্যুষে উঠে এস্তোক নোকের ত' স্বর শুনতিচি—কেউ বলে ওষুদ নেসতে যা—কেউ বলে ডাক্তার ঘরকে যা—কেউ বলে বরফ নেস্‌বি কখন—কত করি বলো?"

—"যা, যা আর লেকচার ঝাড়তে হবে না। একটা কাজে নেই ব্যাটার কথা দেখ না। যা, শীগগির ডাক্তারের কাছে যা।"

—"যেতেচি, তা' অমন করো কেন? তুমি যেন কথায় কথায় মারতি আস! বলনু ত' যেতেচি—"

—"না, তোমায় ফুল বিল্লিপত্তর দিয়ে পূজো করব! তোমার কুঁড়েমীর জন্যে রুগী পটল তুলবে, আর ওর নাম কি, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না;—গোপাল!"

. রোগী পটল তুলবে, এ কথাটা কাণে যাবামাত্র বিহারী চম্‌কে উঠলো —"ষাট, ষাট"...একবার জল ভরা নেত্রে বিলাসের পানে তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে প্রস্থান করলো।

...বিহারী বেণীবাবুর পিতার আমলের ভৃত্য। বেণীবাবুকে সে কোলে পিঠে কোরে মানুষ কোরেছে। কাজেই বেণীবাবুর উপর যে স্নেহটা তা'র বুকে জমা হ'য়েছে সেটা বড় তাচ্ছীল্যের বস্তু নয়। বিলাসের শেষের কথাটা তা'র মর্ম্মে প্রচণ্ড আঘাতই করলো। এক সময় এ গৃহে বিহারীর আধিপত্য খুবই ছিল, চাকরের মত সে থাকত না। এমন কি

তা'র আদেশ বেণীবাবুকে পর্য্যন্ত মেনে নিতে হ'ত সময় সময়।

এখন যদিও তা'র সেদিন চলে গেছে, সে আধিপত্য তা'র নেই; এখন গৃহস্থের শত গালিগালাজ বুকে কোরে গৃহের আবর্জ্জনার মতই সে এক পাশে পড়ে থাকে। তথাপি এ গৃহের মায়া ত্যাগ কোরে সে কোথাও যেতে পারে না। বেণীবাবুর দিক হ'তে সে যতই অবহেলা লাভ করুক তবু তাতেই তা'র আনন্দ। মাঝে মাঝে সে অতীত দিনের কথা চিন্তা করে। ভাবে,...সেই বেণী! যে একদিন এই বিহারীর কোলে আসবার জন্য কিরূপ লালায়িতই হ'ত! এখন সে বড় হ'য়েছে, সংসারী হ'য়েছে, সেই বেণী এখন 'বেণীবাবু' হ'য়েছে। তবু যত বড়ই সে হোক্ বিহারীর কাছে ত' কিছুই তা'র বয়স নয়। বিহারীর কাছে সে সেই বেণীই আছে ....
আর বিলাস বলে কিনা, বেণীবাবু পটল তুলবে—তা'রই চোখের সামনে! বিলাস বললে কি কোরে? তা'র এই চার কুড়ী দশ বছর বয়স হ'ল সে থাকবে এখনো বেঁচে, আর বেণীবাবু ত' কুড়ী পেরুতে না পেরুতে এর মধ্যে পটল তুলবে? বাঃ, বিলাস ত' খুব কথা বললে!

এই সব ভাবতে ভাবতে বিহারী ম্লান মুখে এসে দাঁড়ালো কর্ম্মরত সুরেশ্বরীর পাশে। উপস্থিত এ গৃহে সুধু এই সুরেশ্বরীই একটু আদর যত্ন তা'কে করে। তাই সেও তা'র সকল নালিশ এবং আবেদন সুরেশ্বরীর কাছেই ব্যক্ত করে।

সুরেশ্বরী বিহারীর তদবস্থা লক্ষ্য কোরে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি খবর বিহারী?"

অশ্রুসিক্ত চক্ষুদুটি মুছে নিয়ে বিহারী বল্লে,—"বাকিার ছিরিড়ে একবার

শোনো পিসীমা—ঐ তোমাদের বিলেস বাবু গো,—বলে কিনা আমার জন্যি বাবু পটল তুলবে—"

বৃদ্ধ বিহারী হাউ হাউ কোরে সহসা কেঁদে উঠলো। সুরেশ্বরী কিছু বুঝল না। বিস্মিত নয়নে তা'র পানে তাকিয়ে রইল।

কাঁদতে কাঁদতে বিহারী বল্লে,—"ও তোমরা ঝতই বলো পিসীমা, বিলেসবাবু নোক মোটে সুবিদের নয়। হ্যাঁ নোক ছ্যাল বটে অলকবাবু! আহা বাক্যিতে ঝেন মধু মেকিয়ে রেখেচে! বেহারী বলতি অজ্ঞান। সেই সেবারে ঝখন দিদি মনির অসুখ কোরেছ্যালেন, তোমার মনে আচেন ত'?—সেবার সেই তেনার সেবাতেই ত' দিদিমণির পরাণডা রক্ষে হ'ল। তখন বিলাসবাবু কি দেখতে গেছ্যাল। তিনি যদি থাকত, আজ তাহ'লি বাবুর সেবার জন্যি কি নোককে ভাবতি হ'তেন। বাবুর ঝেমন কাণ্ড, তেমন সুবোদ নোককে আর দেখতে পারি না মোটে—বিলেস বিলেস কোরেই গেল। দিদিমনিরও তাই। বলে, বিলেস ছিক্ষিত! ছিক্ষিত না হাতী! ছিক্ষিত ছ্যাল সেই অলকবাবু...আহা, মনিষ্যি ত' নয়—দেবতা! এ নোক, ও তোমরা ঝতই বলো,—ভালো নয় এ আমি জোর কোরে বলতি পারি।"

বিহারীর কথা শুনে সুরেশ্বরীর বুঝতে বাকী রইল না যে, বিলাস তা'র কোন্‌স্থলে আঘাত দিয়েছে। এমন প্রায়ই হয়, প্রায়ই তা'র কাছে বিলাসের বিরুদ্ধে এমন একটা না একটা নালিশ বিহারী বহন কোরে আনে। শুধু তাই নয়, তা'র সকল নালিশের মধ্যেই এমনি কোরে ফুটে ওঠে অলকের প্রশংসা।

বিহারী হয়ত' আরো অনেক কিছু বলত কিন্তু এই সময় বন্দনার কণ্ঠ

শুনে সে চমকে উঠল। অন্য কক্ষ হ'তে বন্দনা বেশ ঝাঝের সঙ্গেই বিহারীর উদ্দেশে বোলে উঠল,

—"বিহারীর কি গল্প করলেই চলবে? ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না?"

একবার সুরেশ্বরীর পানে তাকিয়ে বিহারী উত্তর দিলে,—"আজ্ঞে যাই এই—"

আর না দাঁড়িয়ে গজ গজ করতে করতে সে চলে গেল।

২০

বেণীবাবুর অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। আজ একজন বড় ডাক্তার বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁ'র অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কোরে বোলে গিয়েছেন, সেবার অভাবেই রোগী মরণের পানে এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। এখনও যদি উপযুক্ত সেবা হয়, তাহ'লে হয়ত' রোগী ভালোও হ'তে পারেন।

কিন্তু যেরূপ সেবার উপর রোগীর জীবন মরণ নির্ভর করছে সেরূপ সেবা কই? গৃহের সকলেই বিশেষরূপ চিন্তায় প'ড়ে গেল।

কয়দিন হ'তে একটি প্রাণীর কথা সুরেশ্বরীর প্রাণে খোঁচা দিচ্ছে, কিন্তু ইচ্ছে কোরেই সে তা' প্রকাশ হ'তে দেয়নি! বন্দনাও যে কথাটা ভাবেনি তা' নয়, অনেকবারই সে সুরেশ্বরীকে কথাটা বল্‌তে এসে ফিরে গেছে, লজ্জায় বল্‌তে পারেনি। তবে জীবন মরণের প্রশ্ন যেখানে, সেখানে লজ্জা, ভয়, ঘৃণা সকল কিছুই পরাভব স্বীকার করে; তাই ডাক্তার যখন ঐ কথা বোলে চলে গেল, তখন আর বন্দনা নিজেকে সংযত রাখতে পারলে না। পিতার জীবনের চেয়ে তা'র সঙ্কোচ, কুণ্ঠা বা ঘৃণা এমন কিছু বড় নয়। সে তাই আজ অনেক ভেবে চিন্তে সুরেশ্বরীর কাছে এসে ডাক্‌লে,

—"পিসীমা!"

সুরেশ্বরী জিজ্ঞাসু নেত্রে তা'র পানে তাকালো। সে নত বদনে অত্যন্ত মৃদু স্বরে বল্লে,—"আচ্ছা পিসীমা, বাবা কি সত্যি সত্যি বাঁচবেন না?" ...তা'র চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিল। একটু চুপ কোরে থেকে সে আবার বল্লে,

—"আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না পিসীমা? মানে একবার, একবার অলককে খবর দিলে হয় না? সে ত' খুব সেবা করতে পারে—আমার অসুখের সময় সেই ত একলা আমার সেবা কোরেছিল! আমার মনে হয় সে যদি বাবার সেবা করে তা'হলে বাবা নিশ্চয় সেরে যাবেন খবর দিলে কি সে আসবে না পিসীমা?"

সুরেশ্বরী এই কথাটাই শোনবার আশা কোরেছিল। সে মনে মনে একটু হেসে আত্মগত ভাবে বল্লে—"প্রয়োজন পড়লে যে তোমাদের অলকের কথা মনে হবে সে আমি জানি। উঃ, কি দারুণ সব নিমকহারাম—অলকের নাম মুখে আনতে এদের লজ্জা করে না!"...প্রকাশ্যে সে বল্লে,—"আসা না আসার কথা পরে, কিন্তু তা'কে পাওয়া যাবে কোথায়? সে যে এখন কোথায় আছে তা' ত' জানি না।"

বন্দনা বল্লে,—"কেন ছায়ার বাড়ীতে খোঁজ করলে, সে বলতে পারবে না?"

সুরেশ্বরী তা'র পানে তাকিয়ে বল্লে,—"ছায়াকে পিসী বোলে ডাকতেও কি তোমার উচ্চ শিক্ষা আজ-কাল বাধা দেয় বন্দনা?"

একটু অপ্রস্তুতের মত হ'য়ে বন্দনা বল্লে,—"ভুলে বোলে ফেলেছি পিসীমা—"

সুরেশ্বরী বল্লে,—"এ ভুল ত' একদিন আমার 'পরেও বর্ষিত হ'তে পারে মা?"...একটুক্ষণ চুপ কোরে থেকে সে বল্লে,

—"যাক্, ও কথা ছেড়ে দাও। তা ছায়ার কাছে যদি তা'র সন্ধান পাওয়া যায়, তাহ'লে দেখ—"

আঁচলের খুটটা আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে বন্দনা অত্যন্ত ধীর গলায় বল্লে,—"আমি ডাকলে সে কি আসবে পিসীমা ?"

সুরেশ্বরী বল্লে,—"সে যদি আসে ত' তোমার ডাকেই আসবে মা, অন্য কেউ ডাকলে আসবে না।"

—"তাহ'লে আজ একবার বিহারীকে পাঠাব ?"

—"পাঠাও—"

এমন সময় বিহারীর কণ্ঠ শোনা গেল,—"পিসীমা—ও পিসীমা !" ...ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই সে সেখানে এসে সুরেশ্বরী এবং বন্দনার পানে তাকিয়ে বল্লে,—"ঝান' গা পিসীমা, রাস্তায় এসতে এসতে অলক বাবুর সঙ্গে সাক্ষেৎ হ'ল। বাবুর অসুখের কথা তেনাকে বলনু। আহা, শুনে তেনার মুখখানি শুকিয়ে ঝেন পক্ষীর মত হ'য়ে গেলেন। তেনাকে একবার এসতেও বলনু—"

তা'কে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বন্দনা জিজ্ঞাসা করলে,—"তা, তা সে কি বল্লে রে ? আসবে ?"

বিহারী সহাস্যে বল্লে,—"বাবুর ব্যামো শুনে সে নোক আবার এসবে না,—এসবে, এসবে।"

—"কখন আসবে রে বিহারী ?"

—"এই খানিক পরেই এসবে গো।"—

বন্দনা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে অন্যত্র প্রস্থান করলো। কোন' কথা আর সেবল্লে না।

সুরেশ্বরী তা'র গমন পথের পানে তাকিয়ে একটু হাসলো। মনে মনে বল্লে,—"তা'র নিষ্ঠার কাছে, তোদের হার মানতেই হবে বন্দনা—প্রয়োজন তা'কে চিরদিন এমনি ভাবে হবেই। কিন্তু তোদের সাহায্য তা'র কোনদিন দরকার হবে না। তা'র স্বর্গীয় ভালবাসার মূল্য এমনি কোরে একদিন তোরা বুঝবি।"

* * * *

সত্যি সত্যিই অলক সেইদিনই কারো ডাকের অপেক্ষা না কোরেই এক সময় এসে উপস্থিত হ'ল। সুরেশ্বরী এবং বন্দনার নিকট বেণীবাবুর রোগের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে সেই যে সে রুগীর পাশে বসেছে আজ প্রায় সপ্তাহের মধ্যে অত্যন্ত প্রয়োজন ব্যতীত আর রুগীর কাছ ছাড়া হয়নি তা'র বিরাম বিহীন পরিচর্য্যার গুণ অল্প সময়ের মধ্যেই রোগীকে আরামের পথে টেনে আনলে। ডাক্তার পরীক্ষা কোরে বোলেছেন,—"রোগীর জীবনের আশঙ্কা আর মোটেই নেই। আর কয়েকদিন পরে রোগীকে অন্নপথ্য দেওয়া যেতে পারে।"...অলকের সেবারও বহু তারিফ ডাক্তার কোরে গেছেন। গৃহবাসীদের মলিন মুখে আবার হাসি দেখা দিয়েছে।

বিলাস যথা নিয়ম আসে আর চ'লে যায়। আজ-কাল বেণীবাবুর অবস্থা ভালোর দিকে যাওয়ায় তবু একটু ব'সে গল্প গুজব করে। লোকের রোগের যন্ত্রনা নাকি সে সহ্য করতে পারে না; তাই বেণীবাবুর বাড়াবাড়ির সময় তা'কে বড় একটা দেখতে পাওয়া যেত না।

বন্দনা ঠিক পূর্ব্বের মত না হ'লেও অলকের সাথে এখন বেশ ভালো ভাবেই কথাবার্ত্তা বলে। বিলাস সেটা যদিও পছন্দ করে না কিন্তু তবু

বাধা দিতে সাহস পায় না, এবং তাঁকেও দায়ে পড়ে কথা বলতে হয় —অলকের সাথে। অলক যে তাঁর বহু গুপ্ত ইতিহাস জানে এ কথাটা জানতে তাঁর বাকী নেই ; সুতরাং অলকের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে সে যে-কোন মুহূর্তেই সব কথা তাঁর ফাঁস কোরে দিতে পারে। সেই জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে তাঁকে বাক্যালাপ করতে হয়। তবে মনে মনে একদিন না একদিন তাঁকে জব্দ করবার সঙ্কল্প সে এঁটে রেখেছে।

২১

অলক আসার পর এবার মালতীও ভেবেছিল, অলকের সান্নিধ্য থেকে নিজেকে একটু তফাতে রাখবে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে তা' পারেনি অলক বেণীবাবুর শুশ্রূষার ভার নেওয়া অবধি ছোট বড় অনেক কাজেই মালতী তা'র পাশে পাশে থেকে সাহায্য করে। তা' দেখে বিকাশ অনেক বার ভ্রূকুটি কোরেছে। বন্দনার কর্ণে নানা অসম্ভব সম্ভাবনার মন্তব্যও প্রকাশ কোরেছে। উত্তরে বন্দনা বোলেছে,—"না, না অলকের হাব ভাব দেখে ত' সে রকম কিছু মনে হয় না। আর অসুখের সেবা করতে গেলে ওসব কুচিন্তা মনে স্থান পায় না।"...

বস্তুতঃ মালতীর কার্য্যকলাপ সকলকেই বিশেষরূপ আশ্চর্য্য কোরে দিয়েছে। অলক নিজেও কম আশ্চর্য্য হয়নি। যে মালতী অলকের নামে চটে যেত।—অলকের নামে মিথ্যা কুৎসা রটাতেও যে দ্বিধা করেনি. সেই আবার এখন অলকের কাছ ছাড়া থাকে না—এটা আশ্চর্য্যের বিষয় ত' বটেই। আবার এটাও লক্ষ্য করবার জিনিষ যে, তা'র হাসি ঠাট্টা, গল্প গুজব ইত্যাদি সকল কিছুরই মধ্যে কোন গলদ পাওয়া যায় না—সব কিছুই বেশ মার্জ্জিত।

সুরেশ্বরী মালতীর ব্যাপার যতই দেখে ততই আরো বিস্মিত হ'য়ে যায়। ভাবে, এ আবার কি নূতন ছলনা!...

যাই হোক! এম্‌নি কোরে প্রায় একটি মাস কেটে গেল। কয়দিন হ'ল বেণীবাবু অন্নজল পথ্য কোরেছেন। শরীর এখনো খুব দুর্ব্বল—নড়া চড়া করতে ডাক্তারের নিষেধ-আছে। অলককে এখন আর তেমন প্রয়োজন নেই। সেও বিদায় নেবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। তবে বেণীবাবু তাঁকে আরো ক'দিন থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করায় সে যেতে পাচ্ছে না। মালতীরও ইচ্ছা নয় সে এত শীঘ্র চলে যায়। সে একটু আব্দারের স্বরেই বোলেছে,—"উনি আর একটু না সারলে তোমায় কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না ঠাকুরপো—"

একটা প্রবচন আছে—'ইলৎ যায় না ধুলে, আর স্বভাব যায় না ম'লে।' মানুষ চেষ্টা কোরে সকল কিছুরই সংস্কার করতে পারে, কেবল পারে না স্বভাবের। অবশ্য সকল ক্ষেত্রে কথাটা খাটে না; কিন্তু মালতীর বেলা কথিত প্রবচনটি মোটেই প্রত্যুদাহরণ হয়নি। মালতী এই দীর্ঘকাল লোক চক্ষে সাধু সেজে থাকলেও অন্তরে সে মোটেই স্বভাবমুক্ত হ'তে পারেনি, অধিকন্তু নিরুপায় বেষ্টনীর মধ্যে বাস কোরে তা'র পঙ্কিল মনটা অধুনা কামনার টানে এমন স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে যা' সাধারনের পক্ষে বর্ণনা করা কঠিন। তবে এক কথায় বলা যেতে পারে যে, এখন যে কোন' বারনারী সতীত্বের স্পর্দ্ধা নিয়ে তা'র পানে তাকাতে পারে।

অলকের কাছে যে প্রত্যাখ্যান সে একদিন পেয়েছিল সে' প্রত্যাখ্যানের যাতনা যদিও তা'কে ক্ষিপ্ত কোরে তোলে, কিন্তু তথাপি সে অলকের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। বাহ্যিক অভিনয় কোরে নিজের সাধুতা প্রমাণের চেষ্টা সে করলেও মনের কদর্য্য লিপ্সাটা তা'র বেড়েছে বৈ কমেনি। এতদিন তবু অলক না আসাতে মনের ইচ্ছাটাকে সে অতি

কষ্টে দমন কোরে রেখেছিল। তারপর যেদিন আবার বেণীবাবুর অসুখ উপলক্ষ কোরে অলককে এ গৃহে আসতে হ'ল, সেদিন থেকেই মালতীর নিজেকে সংযত রাখা কঠিন হ'য়ে উঠলো। তবে অত্যন্ত সতর্ক হ'য়েই সে সর্ব্বদা থাকত—ভাবে বা ভাষায় মনের কুইচ্ছা সে ব্যক্ত করত না, কোন মতেই। কাজেই অলক তা'র অন্তর্নিহিত অভিসন্ধির কথা জানতে পারেনি। সে ভেবেছিল, মালতীর হয়ত' সত্য সত্যই পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, তাই বেশ ভালো ভাবেই সে তা'র সঙ্গে আলাপন করত। এতে মালতীরও আনন্দ অল্প ছিল না। সে ভাবে, হয়ত' এবার অলককে সে বশ করতে পেরেছে। তা'র এইরূপ ভাবনার আরো একটা কারণ ছিল—এতদিন ধ'রে সে বিলাসের কাছে অলকের চরিত্রের যে ব্যাখ্যা শুনে আসছে তাতে এ সন্দেহ করা তা'র পক্ষে মোটেই ভুল হয়নি যে, এখন যে কোন রমণীই অলককে অত্যন্ত সহজে লাভ করতে পারে। চোরকে চুরি করবার সুযোগ দিলে সে যে তা' ত্যাগ করবে না এটা মালতী বেশ ভালোই জানে।

ঐ ধারনার বশবর্ত্তিনী হ'য়ে সেদিন হঠাৎ মালতী এক কাণ্ড কোরে বসল।

রাত্রি তখন অনেক হ'য়েছে। বিলাস তখনো উঠি উঠি কোরে উঠতে পারেনি, কিম্বা হয়ত' রাত্রিবাস এখানেই করবে বোলে মনস্থ কোরেছে। বেণীবাবুর কক্ষে, বেণীবাবু, বন্দনা এবং বিলাস কি একটা আলোচনায় বিভোর হ'য়ে ছিল। কয়দিন হ'ল বেণীবাবু বেশ সুস্থই আছেন। অনেক দিনের পর গল্প করতে পেয়েছেন বোলে সঙ্গীদের আর ছাড়তে চাইছেন না। অলকও এতক্ষণ তাঁ'র কাছে ছিল, এই কতক্ষণ হ'ল

সুরেশ্বরী, মালতী আর সে অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় একটু ছাদের উপর মুক্ত বায়ু সেবন করতে গিয়েছে।…

অলকের মনটা তেমন ভালো ছিল না; তাই গল্প সল্প তা'র ভালো না লাগায় একটু নির্জ্জনতার জন্য ছাদে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুরেশ্বরী এবং মালতীও গেল। ছাদে গিয়ে অলক নিজের হাতের উপর মাথাটা দিয়ে একস্থানে শুয়ে পড়লো। মালতী তা' দেখে তা'র মাথাটা তাড়াতাড়ি কোলের পরে তুলে নিয়ে বল্লে,—"আমার কোলে মাথা রেখে শোও না,—হাতের ওপর কি শোওয়া যায়?"

অতি মাত্রায় বিস্মিত অলক একবার তা'র মুখের পানে তাকালে, কিন্তু জ্যোৎস্নার মৃদু আলোকে তা'র মুখের ভাবটা সে স্পষ্ট কোরে দেখতে পেলে না। মানসিক অবস্থা তা'র মোটে ভাল ছিল না, এখন কি একটা কথা বলাও যেন তা'র বিরক্তিকর হ'য়ে উঠেছিল; সেই কারণে মালতীর এই ব্যবহারের সে কোনই প্রতিবাদ করলে না মাত্র একটু হাসলে।

ব্যাপারটা সুরেশ্বরীরও তেমন ভালো লাগলো না, তবে সেও অলকের মত কোন' কথা বল্লে না।

বহুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কাটার পর এক সময় সুরেশ্বরী কি একটা কাজের জন্য নীচে নেমে গেল। অলককে বোলে গেল,—"অলক, অনেক রাত হ'ল নীচে এসো।"

অলকও উঠে পড়লো।

মালতী বল্লে,—"আর একটু ব'স না ঠাকুরপো—যাবেই এখুন।"

—"না, যাই—রাত প্রায় একটা বাজলো।"…

বলতে বলতে অলক উঠে এসে সোপানের সঙ্কীর্ণ পথটি বেয়ে নীচে নামতে আরম্ভ কোরে দিল।

ত্রস্ত গতিতে মালতী তা'র পিছনে এসে আবেগ জড়িত কণ্ঠে ডাকলে,

—"ঠাকুরপো!"

—"বলো—"

মালতী তা'র কাঁধের উপর একটা হাত রেখে পুনরায় ডাকলে,

—"ঠাকুরপো!"...

—"কি ?"...

অলক জিজ্ঞাসা করলো।

—"তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল ঠাকুরপো।"...অলকের স্কন্ধদেশে স্থাপিত হাতখানা মালতীর কেঁপে উঠলো। অলক সে কম্পন অনুভব কোরে তা'র হাতটা সরিয়ে দিলে। মালতী আবার হাতটা তা'র কাঁধের উপর রাখলে। অলক আবার সরিয়ে দিলে। মালতী এবার তা'র একখানা হাত জোর কোরে ধ'রে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলে,

—"ঠাকুরপো!"

মালতীর কণ্ঠস্বরে অলক চমকে উঠলো। তা'র মনে পড়লো বহুদিন পূর্ব্বের এক রজনীর কথা। সে মালতীর হাতে জোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বোলে উঠলো,

—"আঃ! কি হ'চ্ছে বৌদি?"

...তখন তা'রা নীচের বারাণ্ডায় এসে গেছে। বারাণ্ডার এদিকটায় কোনও কক্ষ না থাকায় এদিকে বড় একটা কেউ আসা যাওয়া করে না। কেবল ছাদে যাবার প্রয়োজন হ'লে ঐ পথটা ব্যবহৃত হয়। বারাণ্ডার

আলোক তখন নির্ব্বাপিত ছিল। অদূরবর্ত্তী বেণীবাবুর কক্ষ হ'তে তখনো মৃদু আলাপন শোনা যাচ্ছিল, এবং তাঁ'রই কক্ষের সল্প আলোক রেখা বারাণ্ডার অপর পারে পড়ায় এদিকের অন্ধকার আরো বেড়ে গিয়েছিল। সুরেশ্বরী ছাদ হ'তে নেমে বেণীবাবুর কক্ষে প্রবেশ করে। গৃহের অন্য কোনও প্রাণীই তখন সেদিকে ছিল না।

মালতী অলকের হাতখানা ধ'রে পুনরায় আকর্ষণ করলে। সে কম্পিত কণ্ঠে বোলে উঠলো,—"ঠাকুরপো, একটা কথা—"

হাতটা মুক্ত কোরে নিয়ে কঠিন কণ্ঠে অলক বল্লে,

—"মনের অবস্থা আমার বড় খারাপ বৌদি, ভালো লাগছে না—ছাড়, হাত ছাড়—বিরক্ত কোরো না"—

—"একটা কথা ঠাকুরপো—শুধু একটা কথা"—

—"কাল শুনবো, আজ নয়,—সর' বলছি—"

—"না, সরবো না, কিছুতেই সরবো না...তোমার মনটাই শুধু দেখ্‌ছ —আমার মনে কি হ'চ্ছে জান? আমি, আমি যে আর কিছুতে—"

অভাবনীয় ভাবে সহসা মালতী তা'র কণ্ঠদেশ বেষ্টন কোরে বোলে উঠলো,

—"ঠাকুরপো"—

মালতীর ধারণাতীত আচরণে অলক স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। ক্ষণকাল কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত থেকে সে সবলে নিজেকে মুক্ত কোরে নিয়ে মালতীকে একটা ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলে। তৎক্ষণাৎ কিন্তু মালতী আবার এসে তা'কে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ কোরে তা'র গণ্ডস্থলে উপর্য্যুপরি কয়েকটা চুম্বন বসিয়ে দিলে।

অলকের মনে হ'ল যেন একটা বিষাক্ত সর্প তা'র গণ্ডে কয়েকটা দংশন করলে। রোষে আত্মহারা অলক তা'কে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে। সে ধাক্কার বেগ সাম্‌লাতে না পেরে মালতী পশ্চাতে সিঁড়ির দরজাটার উপর সশব্দে নিপতিত হ'ল।

তা'র পতনের শব্দে বেণীবাবুর কক্ষ হ'তে তাড়াতাড়ী বন্দনা এবং সুরেশ্বরী বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে,—"কে কে? কে পোড়ে গেল?"... ত্রস্ত হস্তে বন্দনা বারাণ্ডার বৈদ্যুতিক বাতিটা জ্বেলে ফেল্‌লো। মালতীর ও অলকের উক্ত অবস্থা লক্ষ্য কোরে তা'রা বিস্মিত হ'য়ে গেল। মালতীর চক্ষু দু'টোয় তখন যেন আগুন জ্বলছে। মালতীর পানে তাকিয়ে বন্দনা প্রশ্ন করলে,

—"কি হ'ল—পোড়ে গেলে?"

সহসা মালতীর চক্ষে অশ্রুর বন্যা নেমে এলো। কাঁদতে কাঁদতে সে বল্লে,

—"তোমাদের কত বার বোলেছি—এখন দেখ, দেখ তোমাদের আপনার লোকের কীর্ত্তিটা!—ঠাকুরঝি ছাদ থেকে নেমে আসতেই, আমিও আসছিলুম এ পোড়ার মুখো আমায় কিছুতেই আসতে দেয় না; জোর কোরে এতটা পথ নেমে এলুম। এখানে এসেই যেই তোমাদের ডাক্‌তে যাব অম্‌নি—"

অলকের পানে তাকিয়ে সে বোলে উঠলো,

—"তোর কি মা'-বোন নেই রে হারামজাদা? ওরে ও পাঁঠা, ও সর্ব্বনেশে! অত যদি, তাহ'লে বাজারে ত' অভাব নেই—সেখানে মরতে যাস না কেন? অলপ্পেয়ে, নির্ব্বংশে!"

তা'র অদ্ভুত অভিনয় দর্শনে স্তম্ভিত অলকের কণ্ঠ হ'তে উচ্চারিত হ'ল,—"বাঃ, সুন্দর!"

বন্দনা তা'র কাছে এগিয়ে এসে কঠিন স্বরে বল্লে,—"অলক! তুমি এত হীন! হ্যাঁ—এ যে ভাবা যায় না! উঃ, কি সর্ব্বনাশ!—এক্ষুণি তুমি এখান থেকে চলে যাও,—যাও"—

ততক্ষণে বেণীবাবু এবং বিলাসও বেরিয়ে এসেছিল। সমস্ত শুনে বেণীবাবুর দুর্ব্বল শরীর তখন ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপছে। তিনি তর্জ্জনী আন্দোলন করতে করতে চীৎকার কোরে উঠলেন,

—"ছোটলোক, বেল্লিক কোথাকার! ভালো মানুষ সেজে এমনি কোরে তুই লোকের সর্ব্বনাশ করিস? বেরো—বেরো আমার বাড়ী থেকে।—এই বেহারী, বেহারী—"

অলক কি একটা বল্‌তে গেল। তা'কে বাধা দিয়ে বেণীবাবু পূর্ব্ববৎ চীৎকার কোরে বল্লেন,—"না, না তোর কোন' কথা শুন্‌তে চাই না, তুই আমার বাড়ী থেকে শীগগির বেরিয়ে যা। তোর টাকা পারিস ত' কোর্ট থেকে আদায় কোরে নিস্—আমার বাড়ীতে আর আসিস্‌নি...না, বেরিয়ে যা"—

তা'র কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই বিলাস এগিয়ে এসে প্রচণ্ড জোরে অলকের নাসিকার 'পরে একটা মুষ্টাঘাত কোরে বোলে উঠলো,—"Scoundrel, Brute; get out—Rascal কোথাকার! ওর নাম কি মা'র জামির আর জায়গা পাওনি!"···সঙ্গে সঙ্গে আরো গোটা কয়েক ঘুষো সে তা'র মুখের 'পরে চালিয়ে দিলে।—"get out ওর নাম কি get out বলছি; নইলে খুন কোরে ফেলবো"—

এমন চকিতে ব্যাপারটা ঘটল যে, একটা প্রতিবাদ করবার অবসর পর্য্যন্ত অলক পেলো না। নাক মুখ দিয়ে তা'র রুধিরের স্রোত ব'য়ে গেল। অন্য সময় হলে তা'র দেহে যা শক্তি আছে তাতে কোরে এমন দশটা বিলাসকে সে সায়েস্তা কোরে দিতে পারত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে একটাও কথা বললে না। তা'র শনিঃপ্লুত আননে মাত্র একটু ম্লান হাসি খেলে গেল। একবার বন্দনার পানে তাকিয়ে সে ডাকলে,

—"মা!"

—"না, না কোন কথা নয় তুমি এখুনি বেরিয়ে যাও।"

আর কোন' কথা না বোলে ধীরে ধীরে অলক প্রস্থান করলো। মাতালের মত টলতে টলতে সে সদর দরজার কাছে এলো। এমন সময় তা'র পিছন হ'তে করুণ কণ্ঠে সুরেশ্বরী ডাকলে, —"অলক!"

—"দিদি"—

"আমি তোমায় ভুল বুঝিনি ভাই"—

অলকের মুখে ফুটে উঠলো তা'র স্বভাবসিদ্ধ সেই মৃদু হাসি। দরজাটা মুক্ত কোরে সে রাস্তায় বেরিয়ে এসে সুরেশ্বরীকে বল্লে,—"আসি দিদি—"

বাড়ীর ভিতরে তখন অলকের চরিত্র নিয়ে গভীর আলোচনা চলেছে।

সুরেশ্বরী অলকের গমন পথের দিকে চেয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বল্লে,—"অনেক দেওয়ার এই প্রতিদান!"

(২২)

তারপর মাস কয়েক কেটে গেল। ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ঘটেনি।—কেবল মাত্র পূর্ব্ব ঘটনার কয়েক দিন পরে সুরেশ্বরী একটা অছিলা দেখিয়ে বেণীবাবুর গৃহ ত্যাগ করে। এবং ছায়ার বাড়ী যেয়ে ওঠে। সেই হ'তে সে আর এতদিন এখানে আসেনি! মাত্র এই দিন পাঁচেক হ'ল আবার তা'কে বন্দনার বিবাহের জন্য আসতে হ'য়েছে এও তা'র আসতে ইচ্ছা ছিল না, তবে বেণীবাবুর অনুরোধ কোন মতে এড়াতে না পেরে বাধ্য হ'য়ে তা'কে আসতে হ'য়েছে।

...আজ বন্দনার বিবাহ। নানা অতিথি-অভ্যাগতের আগমনে বেণীবাবুর গৃহ পূর্ণ হ'য়ে গেছে। আনন্দ কলরবে গৃহটি মুখর হ'য়ে উঠেছে। বহির্দ্বারে বসেছে সানাই; তা'র প্রভাত রাগিনীর মধুর সুর প্রতিবাসীদের কর্ণে সে' উৎসব বার্ত্তা জ্ঞাপন করছে।

বেণীবাবুর কার্য্যের অন্ত নেই—একবার এদিক একবার ওদিক ঘোরে তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠেছেন। বাজার হাট থেকে আরম্ভ কোরে সকল কিছুই তাঁ'কে নিজের হাতে করতে হ'চ্ছে। সাহায্য করার তেমন একটা লোকও কেউ নেই। পুত্র মণ্টুর, পরে কোন' কার্য্যের ভার দিয়ে বিশ্বাস নেই। তার উপর তা'কে পাওয়াও মুস্কিল, সে সর্ব্বদা আপনার কাজেই ব্যস্ত। কখন কার অসতর্ক মুহূর্ত্তে সোনাটা দানটা সে বেশ

কৌশলের সঙ্গে হস্তগত করতে পারে সেই চেষ্টাতেই সে সচেষ্ট। কাজেই গুণের সাগর পুত্রের উপর কোন' আস্থা স্থাপন করা চলে না।

গৃহিণী মালতীরও কর্ম্মের বিরাম নেই—গৃহের যত কিছু অকাজ সবই তাঁ'কে একা সম্পাদন করতে হ'চ্ছে।

একটু বেলা হাবার সঙ্গে সঙ্গে নানা আত্মীয়-কুটুম্বের গৃহ হ'তে নানা উপঢৌকন আসতে লাগলো। মালতী সেগুলির রীতিমত তত্ত্বাবধান করতে লেগে গেল।

সুরেশ্বরী কোন কিছুতেই নেই। সে ঠিক কুটুম্বের মত সকল কাজ হ'তে দূরে দূরে আছে।...সুরেশ্বরীর ঐরূপ ছাড় ছাড় ভাব দেখে মালতী আর থাকতে পারলে না। সে বল্লে,—"ঠাকুরঝি, অমন হাত গুটিয়ে বস্ থাকলে ত' চলবে না ভাই,—একলা আমি কত কোরবো।"

সুরেশ্বরী বল্লে,—"তোমরা পাকা গিন্নী থাকতে আমাকে আর কেন' টান।...ঐ ত' বেশ হ'চ্ছে—"

মালতী একবার তাঁ'র দিকে চেয়ে বল্লে,—"তুমি যেন ঠিক পরের মত কথা বল্‌চো ঠাকুরঝি—"

সুরেশ্বরী মৃদু হাস্তে বল্লে,—"ভায়ের সংসারে বোনের একটু পরের মত থাকাই ভালো বৌদি, না হ'লে নানা গোল উপস্থিত হয়।"

ভ্রূ কুঞ্চিত সহকারে মালতী প্রশ্ন করলে,—"কেন' গো, তোমার সঙ্গে কি গোল করা হ'য়েছে? একলা সব দিক কোরে উঠতে পাচ্ছি না বোলে তোমায় না হয় একটা কথাই বোলেছি; তা এতেই যদি এত দোষ হ'য়ে থাকে, মাফ্ করো ভাই।"

সুরেশ্বরী আর কথা না বাড়িয়ে অন্যত্র প্রস্থান করলো। এমন সময়

নানা উপঢৌকনের সাথে ছায়ার কাছ হ'তেও একটা বেশ বড় রকমের উপায়ন এসে উপস্থিত হল। প্রায় দশ-বার জন তত্বটা বহন কোরে আনলো।

মালতী চীৎকার কোরে ডাকলে,—"ও ঠাকুরঝি, ঠাকুরঝি! এই এদিকে এসো—ছায়া তত্ত্ব পাঠিয়েছে।"

কয়েকটি মহিলা ছায়ার প্রেরিত দামী দামী উপঢৌকন গুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরে বল্লেন,—"বাবা, কম জিনিষ পাঠায়নি ত', গায়ে হলুদের তত্ত্বকে হার মানিয়ে দিলে! এ কে পাঠিয়েছে গা বৌ?"

মালতী বল্লে,—"ঠাকুরঝির ননদ—"

সুরেশ্বরী ততক্ষণে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। তা'র প্রতি কটাক্ষ পাত কোরে মালতী বল্লে,—"রাজরাণী একবার কষ্ট কোরে আসতে পারলেন না—লৌকিকতা কোরে তত্ত্ব পাঠিয়েছেন এমনে দু মাস তিন মাস এসে থাকতে পারে, আর একটা কাজের বাড়ী,—আনতে যাওয়া হ'ল তবু এলো না।"...

বাস্তবিকই দু'তিন বার বেণীবাবু নিজে আনতে যাওয়া সত্বেও ছায়া আসেনি। সে বেণীবাবুর অনুরোধের উত্তরে বোলেছে,—"না দাদা, আমার যাওয়াটা উচিৎ হয় না। কারণ একটা শুভ কর্ম্মে আমার মত অসতীর না যাওয়াই ভালো।"...

এ কথার উত্তরে বেণীবাবুকে লজ্জিত হ'য়েই ফিরতে হ'য়েছে—তা'কে আর জোর করতে পারেননি।...

মালতী জিনিষ পত্রগুলি গুছিয়ে তুলতে তুলতে বল্লে,—"তা' বোলে এ কাজটা কিন্তু ছায়ার ভালো হ'ল না ঠাকুরঝি—কর্ত্তা যখন নিজে

তাঁকে আনতে গেল, তখন তাঁর না আসাটা ভালো হল না। উনি কত দুঃখ করতে লাগলেন!"

সুরেশ্বরী বল্লে,—"তা হয়ত' ভালো হয়নি; কিন্তু বৌদি' 'জুতো মেরে গরু দান' করা চলে কি?"

কথাটা কি উদ্দেশে বলা মালতীর তা' বুঝতে বাকী রইল না। সে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে একবার সুরেশ্বরীর পানে তাকিয়ে বেশ রাগত স্বরে কি একটা কথা বল্‌তে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় নিকটস্থ মহিলাদের মধ্য হ'তে একজন জিজ্ঞাসা করলেন,—"হ্যাঁগা বৌ! ও রেকাবীখানার ওপর ওটা কি গা—যেন কাগজের মতন?"

মালতীর এবং সুরেশ্বরীর দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হ'ল। তা'রা দেখ্‌লে ছায়ার গৃহ হ'তে আগত জিনিষগুলির মধ্যে একটি রূপার ডিসের পরে একখানি সবুজ লেফাফা রয়েছে। লেফাফার পরে লেখা আছে,—"শ্রীমতী বন্দনা দেবীর বিবাহে, স্নেহ ও ভক্তির নির্দ্দর্শন" নীচে স্বাক্ষর করা আছে, "অলক"—

সুরেশ্বরী চম্‌কে উঠলো। মালতী খামের 'পরে লিখিত বর্ণগুলির প্রতি কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সেগুলি বোঝবার ব্যর্থ চেষ্টা কোরে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি লেখা আচে গা ঠাকুরঝি?"

সুরেশ্বরী বল্লে,—"ও বন্দনার একখানা চিঠি"—

বন্দনা নিকটেই দাঁড়িয়েছিল; সে শুনে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বল্লে, —"কার চিঠি? আমার? কৈ দেখি"—

অত বড় একটা অপরাধ করার পর নির্লজ্জ অলক যে আবার এ ভাবে বন্দনাকে পত্র দিতে পারে এটা বন্দনা ভাবতে পারেনি। তাই

পত্রখানি হাতে নিয়ে মুখটা বিকৃত কোরে সে আপন মনে বল্লে,—"আচ্ছা বেহায়া লোক ত'!

একবার ভাবলে, চিঠিখানা টান মেরে ফেলে দেবে, তারপর কি ভেবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখানা খুলে ফেল্‌লো। খামটার মধ্যে ছোট বড় মাপের প্রায় পাঁচ ছয় খানা কাগজ একত্রে দেখে সে বল্লে,—"বাবা, এত সব কি!"...সহসা তা'র মুখটা শুকিয়ে গেল। ঐ কাগজগুলির মধ্যে অলকের হস্তলিখিত ছোট্ট একখানি পত্র সে পেলো। তাতে লেখা আছে:—

—"মা,...আজ তোমার বিবাহ—সংবাদটা শুনে পর্য্যন্ত কি পরিমাণ আনন্দ যে আমার হ'চ্ছে তা' ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। একদিন দেবতার আশীর্ব্বাদেই তোমাকে পেয়েছিলাম। দুনিয়ার অনাদর, ঘৃণা, অপমানে জর্জ্জরিত জীবনখানা নিয়ে চলতে চলতে সহসাই তোমার সাথে সেদিন দেখা হ'য়েছিল। আমার স্বর্গগতা জননীর স্নেহ মধুর মুখখানির প্রতিচ্ছবি যেন সেদিন তোমার মুখে আমি দেখে'ছিলাম। তাই মাতৃহারা স্নেহ বুভুক্ষিত প্রাণটা নিয়ে আমি ছুটে গিয়েছিলাম তোমার দরবারে—একটু স্নেহের কামনায়। পেয়েওছিলাম—তোমার স্নেহ ঝরণায় অবগাহন কোরে আমার মরুদগ্ধ প্রাণ অনেক শান্তি লাভ কোরেছিল। কিন্তু সইল না, আমার দুর্ভাগ্য সে শান্তি বেশীদিন উপভোগ করতে পারলে না।

যাই হোক্ সে জন্য কাউকে আজ আমি দোষী করতে চাই না। আমার অদৃষ্টই তার জন্য দায়ী। প্রথম দর্শনে তোমায় আমি মা' বোলে ডাকি। বয়সের তুলনায় তুমি আমার অত্যন্ত ছোট, এমন

কি আমার কন্যা স্থানীয়া বললেও ভুল বলা হয় না, তবুও তোমাকে মাতৃত্বের মর্য্যাদা দিতে কোন দিন দ্বিধা করিনি। আজ আমি তোমার অন্তর থেকে স্থানচ্যুত; কিন্তু আমার অন্তরে তোমার স্থান ঠিক সেইরূপই আছে, এবং চিরদিন অটুট থাকবে।...জননীর বিবাহ দর্শন পুত্রের নিষিদ্ধ। তাই হয়ত' বিধাতার ইচ্ছায় তোমার বিবাহ দর্শনে আজ আমি বঞ্চিত হ'য়েছি।...থাক্, সে কথার আলোচনা কোরে তোমাকে আজ আর বিরক্ত করতে চাই না। স্বধু এইটুকু বোলেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই—তোমার বিবাহে আনন্দিত চিত্তে অনেক কিছুই করবার আশা ছিল, হ'ল না। তোমার অসচ্চরিত্র, লম্পট সন্তান আজ তাই তোমার বিবাহে তা'র নিঃসম্বল জীবনের সামান্য সম্বল তোমার পিতার প্রদত্ত এই হ্যাণ্ডনোট ক'খানি পাঠাচ্ছে, উপঢৌকন স্বরূপ। এ কাগজ কয়খানি যদি তোমাদের সামান্য প্রয়োজনেও আসে তাহ'লেই আমি যথেষ্ট আনন্দ লাভ করব। এছাড়া তোমাকে উপহার দেবার মত আজ আর আমার কিছুই নেই। ইতি—'ভিখারী অলক'—"

পত্র পাঠ শেষ কোরে বন্দনা হ্যাণ্ডনোট গুলির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে; দেখলে, দফে দফে অলকের কাছ হ'তে তা'র পিতা যা' অর্থ কর্জ্জ কোরেছেন তার পরিমাণ প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। তা'র মনে হ'ল, অলকের প্রেরিত হ্যাণ্ডনোটগুলি যেন এক একটা মোটা অর্থের দাবী নিয়ে তা'র পানে জলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। "উঃ, এত টাকা বাবা অলকের কাছ থেকে ধার কোরেছেন! কৈ এ কথা ত' কোন দিন বলেননি আমাকে।...আর, আর অলক নিঃস্বার্থ ভাবে এতগুলো

টাকা ছেড়ে দিলে!"...আপন মনে কথাগুলি আন্দোলন করতে করতে সে পিতার সন্ধানে প্রস্থান করলো।

যথা রীতি বিবাহ কার্য্য গতকাল সমাধা হ'য়ে গিয়েছে। আজ বর-বধুর বিদায়ের পালা। করণীয় নিয়ম গুলি সেরে—গুরুজনদিগের আশীর্ব্বাদের রাশি মাথায় নিয়ে বর-বধূ গ্রন্থি-বন্ধন অবস্থায় যখন সুবৃহৎ এবং পুষ্প ভারে সুসজ্জিত মটর খানিতে এসে বসলো তখন বেলা অনেক খানি হ'য়ে গেছে।

বিলাসের খুব দূর সম্পর্কের এক মাতুল এ বিবাহের বরকর্ত্তা। তিনি উপর্য্যুপরি কয়েক টিপ নস্য নাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, নাসা কুঞ্চিত কোরে বোলে উঠলেন,—"ওহে! বারবেলা পড়তে আর দেরী নেই—শীগ্‌গির গাড়ী স্টার্ট দাও—"

অল্পক্ষণ মধ্যেই গাড়ীখানি চলতে আরম্ভ কোরে দিল। বর-বধূ পরস্পরের পানে একবার আড়নয়নে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করলে।

বধু বেশী বন্দনা বিলাসের কাণের কাছে মুখ নিয়ে যেয়ে অত্যন্ত মৃত্যন্ত মৃদুস্বরে বল্লে,

—"একটা দিন জীবনের অক্ষয় স্মৃতি!"—

বিলাস একটু হাসলো।

গাড়ীর গতি ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হ'য়ে তখন পূর্ণ বেগে ছুটে চলেছে—চলেছে—সার্কুলার রোডে বিলাসের গৃহাভিমুখে বন্দনা পুনরায় বিলাসকে কাণে কাণে বল্লে,

—"আজ থেকে আমার কাছে তোমার নোতুন নাম হ'ল—'ওগো'!—"

উভয়েই মৃদু গুঞ্জনে হেসে উঠলো।

এই সময় একটা পথ ভিখারী গাড়ীটার দিকে চেয়ে গেয়ে উঠলো।

"শতেক বরষ পরে বঁধুয়া মিলন ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস…"

দুজনেই চম্‌কে উঠে সেদিকে তাকালে।

গাড়ীখানি ইতিমধ্যে প্রায় শ্যামবাজারের মোড়ের কাছা কাছি এসে পড়েছে। কতকগুলি লোক মোড়ের এক স্থানে জমায়েত হ'য়ে জটলা পাকাচ্ছিল। বর-কণে সহ গাড়ীটা তাদের দৃষ্টি পথে পতিত হ'তেই তা'রা সাগ্রহে বল্লে,—"খুব সাজিয়েছে গাড়ীটা না?—সুন্দর হাঁসটী তোয়ের কোরেছে!"…হংসাকৃতির অনুকরণে গাড়ীটা সাজান হ'য়েছিল। লোকগুলি সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, কেউ বা নিজের জীবনকে ধিক্কার দিতে লাগলো—কেউবা আগত এম্‌নি এক শুভদিনের কল্পনায় বিভোর হ'য়ে গেল।

ঠিক সেই সময় তাদের পিছন দিক হ'তে একটি লোক সতৃষ্ণ নয়ন দুটি চলন্ত গাড়ীটার মধ্যে স্থাপন কোরে বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থায় ভীড় ঠেল্‌তে ঠেলতে ক্ষিপ্র পদে সামনের দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগলো। গাড়ীটা তখন একেবারে সামনে এসে গেছে। কল্পনার রঙিন স্বপ্নে বাধা পেয়ে একটি যুবক সেই লোকটাকে সজোরে একটা ঠেলা দিয়ে বলে উঠলো,—"আচ্ছা লোক ত'!"…ধাক্কার প্রচণ্ডতায় টাল্ সামলাতে না পেরে লোকটি ঠিকরে রাস্তার 'পরে নিক্ষিপ্ত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বর-কনে বাহী

সজ্জিত মটরখানিও অপর একটি পথিককে বাঁচাতে গিয়ে সবেগে এসে তা'র ভূলুণ্ঠিত দেহের উপর পড়লো।—পথচারীদের—"গেলো, গেলো"… ধ্বনির সঙ্গে উত্থিত হ'ল একটা অব্যক্ত মর্ম্মবিদারক আর্ত্তনাদ,

—"মাগো—"

চালক ব্রেক কোরে গাড়ীটা তখন থামিয়ে ফেলেছে এবং জনতা গাড়ীখানা ঘিরে মহা সোরগোল আরম্ভ কোরে দিয়েছে। ইতিমধ্যে দু'চার জন পুলিস প্রহরীও সেস্থানে এসে গেছে।

গাড়ার ভিতর হ'তে বধু বেশী বন্দনা সহসা চীৎকার কোরে উঠলো,

—"অলক—অলক চাপা প'ড়েছে—"

—"য়্যাঁ"—গাড়ীর মধ্যে ব'সে বিলাস তখন থর্ থর্ কোরে কাঁপছে। বন্দনা তা'কে ঠেলা দিয়ে ভীতি পূর্ণ ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে,

—"বেঁচে আছে, না মারা গেল?—উঠে একবার দেখ না—"

সামনেই একটি ছেলে দাঁড়িয়েছিল। সে বল্লে,—"না মারা এখনো যায়'নি তবে যাবে,—পেটে আর মাথায় ভীষণ লেগেছে কি না"—

বন্দনা জিজ্ঞাসা করলে,—"জ্ঞান আছে ত'?"

ছেলেটি বল্লে,—"না, ছিল না, এখন অল্প জ্ঞান এসেছে বোধ হয়!"

কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ততক্ষণে অলকের রক্তাক্ত দেহটীকে একটি ট্যাক্সিতে এনে শুইয়ে দিয়েছে—প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য 'মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালে' নিয়ে যাবে বোলে। আর কয়েকটি যুবক বিলাসের ড্রাইভারের উপর মহা তম্বি আরম্ভ কোরে দিয়েছে। মটরের ফুটবোর্ডের দুইধারে চার পাঁচটি কন্‌স্ট্যাব্‌লও দাঁড়িয়ে খুব চেঁচামেচি করতে লেগে গেছে।

বিলাস এদিক ওদিক তাকিয়ে, অবস্থাটা একবার দেখে নিয়ে বোলে উঠলো,—"আরে, ওর নাম কি, এত' আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি! ঐ লোকটাই ত' এসে আমাদের গাড়ীর ওপর পড়লো—আমাদের কি দোষ"—

এমন সময় পার্শ্বে দণ্ডায়মান ট্যাক্সির মধ্যে শায়িত আহত অলক ইঙ্গিতে একটি পুলিসকে কাছে ডেকে অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বল্লে,—"আমি নিজের দোষেই চাপা প'ড়েছি, ওদের কোন' দোষ নেই"—

কথা কটি বোলে অলক অবসন্ন হ'য়ে পড়লো। দারুণ যন্ত্রনায় মুখ খানা বিকৃত কোরে সে একটা দীর্ঘশ্বাস কষ্টে ত্যাগ করলে। তা'র অন্তরের 'নভৃতস্থল হ'তে একটা ব্যথা কাতর ধ্বনি নির্গত হ'ল,—"উঃ—উঃ, মাগো—!"...সে অচেতন হ'য়ে পড়লো। তা'র অবস্থা লক্ষ্য কোরে ট্যাক্সিখানি আর কাল বিলম্ব না কোরে পূর্ণ গতিতে হাসপাতালের দিকে ছুটলো।...

গ্রহ বিপাক একেই বলে.. দিনের পর দিন অত নিগ্রহ সহ্য কোরেও অলকের চেতনা হয়নি। বন্দনার বিবাহের খবর তা'র কানে যেদিন থেকে পৌঁছেচে সেদিন থেকেই তা'র স্নেহাতুর প্রাণ একটিবার বন্দনাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু সেই ব্যাকুলতা মিটাবার উপায় তা'র ছিল না দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়ে ইতিমধ্যেই তা'র ত' বন্দনাদের গৃহে প্রবেশাধিকার নষ্ট হ'য়েছে। কাজেই ধৈর্য্য ধ'রে সে এইদিনটার প্রতীক্ষাতেই উন্মুখ হ'য়েছিল। কারণ সে জানত, এই পথ দিয়েই বর-বধুকে ফিরতে হবে। আর সেই সঙ্গে সে এটাও ভেবেছিল যে তা'র আশাবদ্ধ প্রাণের ক্ষুধাও হয়ত' সে মিটিয়ে নিতে পারবে—এই পথের

পাশে দাঁড়িয়ে থেকে নববধূর বেশে তা'র প্রাণের বন্দনাকে একবার দেখে নিয়ে।

সেইজন্যই আজ প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সে এসে পথের পার্শ্বে চুপটি কোরে দাঁড়িয়েছিল—আকাঙ্ক্ষিত প্রাণীটিকে দেখবার আশায়, উজ্জ্বল চক্ষুটি সম্মুখে প্রসারিত কোরে।

তারপর গাড়ীখানা তা'র দৃষ্টি পথে পড়তেই সে আর আপনাকে স্থির রাখতে পারলে না,—আরো একটু ভালো কোরে বন্দনাকে দেখবার মানসে সে আত্মহারার মত সামনে এগিয়ে যেতে গেল, এবং যার ফলে হ'ল ঐ দুর্ঘটনা।...

সংবাদটা প্রচার হ'তে বেশী দেরী হয়নি। সুরেশ্বরী এবং ছায়ার কর্ণে সংবাদটা পৌঁছিবামাত্র চোখের জল ফেলতে ফেলতে তা'রা হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

অলকের দেহে তখন নানা স্থানে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধা হ'য়েছে—প্রয়োজন বোধে ডাক্তার সাহেব তা'র দেহের নানা স্থানে ইতিমধ্যে অস্ত্রপ্রয়োগ কোরেছেন। জীবনের আশা তা'র খুবই অল্প। ছায়া ও সুরেশ্বরী যখন পৌঁছাল, তখন সাধারণ রোগীদের সাথে অলকও অচৈতন্য অবস্থায় একটি খাটিয়ার 'পরে প'ড়ে ছিল।—

তা'র অবস্থা দেখে ছায়া ও সুরেশ্বরীর চক্ষে অশ্রু বন্যা নেমে এলো। কতক্ষণ পর্য্যন্ত তা'র ক্ষত বিক্ষত যন্ত্রনা মাখা মুখটির পানে তাকিয়ে থেকে এক সময় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ছায়া বল্লে,

—"না, না কিছুতেই না—এমন কোরে আমি অলকদা'কে কিছুতে থাকতে দোব না"—

তৎক্ষণাৎ হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধ কোরে এবং কুণ্ঠা বিহীন ভাবে বহু অর্থ ব্যয় কোরে ছায়া অলকের জন্য স্বতন্ত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করলো। ধনীদের মতই অলকের চিকিৎসার সর্ব্ব বিষয় সুবন্দবস্ত করা হ'ল।···

তারপর চল্‌লো অলকের জীবন নিয়ে যমের সাথে মানুষের সংগ্রাম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছয়টি মাস কেটে গেল...যমে মানুষের যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত মানুষই হ'ল জয়ী। ছায়ার অকাতর অর্থব্যয় এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা নিরর্থক হ'ল না। ধীরে ধীরে অলক আরামের পথে এগিয়ে এলো। ক্রমে একদিন সে হাস্‌পাতাল হ'তে মুক্তিও পেলো। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যা'রা তা'র ঐ দুর্ভোগের কারণ সেই বন্দনা, 'বলাস এবং বেণীবাবু এই দীর্ঘকালের মধ্যে তা'র কোন খোঁজ খবর করেন্‌নি—দেখ্‌তে আসা ত' দূরের কথা।

অবশ্য বেণীবাবুকে এজন্য দোষ দেওয়া চলে না; কারণ কন্যার বিবাহের পর মাত্র কয়দিন তিনি জীবিত ছিলেন। তারপর সহসাই একদিন যমরাজের আহ্বানে পৃথিবী থেকে তাঁকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয়।

অকস্মাৎ পিতৃ বিয়োগের বেদনাটা বন্দনার বুকে তীব্র আঘাত করলেও, নূতন জীবনের আনন্দে সে বেদনা ভুলতে তা'র দেরী হয়নি। ভুলতে পারিনি শুধু সুরেশ্বরী। ভায়ের মৃত্যুতে সে একেবারেই ভেঙে পড়েছিল। ভ্রাতৃজায়া মালতীর কথা স্মরণ কোরেও সে কম ব্যথা অনুভব করেনি। বৈধব্যের যন্ত্রনা সে যে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। তাই বেণীবাবুর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই সে ছুটেছিল মালতীর কাছে—তা'কে একটু স্বান্তনা দেবার জন্য; কিন্তু যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ফিরেছিল আরো কিছু ব্যথা হৃদয়ে সঞ্চয় কোরে। মালতীর যে অবস্থাটা কল্পনা কোরে সে ছুটে গিয়েছিল, তা'র ঠিক বিপরীত অবস্থাই সে গিয়ে দেখেছিল। শোকের কোন চিহ্নই সে মালতীর মধ্যে খুঁজে পায়নি। বরঞ্চ পূর্ব্বের

অপেক্ষা তাঁকে ভালোই দেখা গিয়েছিল। তাঁর আগমনে মালতী মোটেই সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি। মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গী কোরে সে বলেছিল,

—"কি গো—কি মনে কোরে? মজা দেখতে এসেছ নাকি?—ভেবেছ বুঝি, এই অবসরে বৌদি'কে একটু দরদ দেখিয়ে যা' পাওয়া যায় তাই হাতিয়ে নিয়ে যাবে, না?"

অশ্রুমুখী সুরেশ্বরী তাঁর পানে কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে থেকে বোলেছিল,

—"ওকি কথা ব'লছ বৌদি'!

—"ঠিক কথাই ব'লছি—তোমাদের চিনতে আর আমার বাকী নেই। তোমরা যে কেমন আপনার লোক তা' আমি জানি।"

এ কথার পর সুরেশ্বরী আর মুহূর্ত্তকাল সেখানে দাঁড়ায়নি—চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে ভ্রাতৃজায়ার গৃহ পরিত্যাগ কোরেছিল।...

তারি ঠিক্ মাস দুই পরে শোনা গেল, মিউনিসিপালিটীর বক্রো খাজনার জন্য বেণীবাবুর গৃহ নিলাম বিক্রী হ'য়ে গেছে, এবং মালতী নিরুদ্দেশ। মণ্টু ইতিপূর্ব্বেই জননার পথ বেছে নিয়েছিল।

কয়মাসের মধ্যেই বেণীবাবুর সংসারে একটা প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে গেল; সে ঝড়ে সমস্ত একেবারে ওলট-পালট হ'য়ে গেল।

......এদিকে বন্দনারও আনন্দ স্রোতে ক্রমশঃ ভাঁটা পড়তে শুরু হ'য়েছে। বিলাসের প্রকৃত স্বরূপ এ ক'মাসেই সে অনেক জেনে নিয়েছে। নিজের ভুল সে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু বুঝলেও এখন ত' তা'র সংশোধনের উপায় নেই। বিলাসের স্বভাবে যত দোষই থাক্—হোক্ সে বেশ্যাসক্ত,

অসচ্চরিত্র, মাতাল, তবু সে যে তা'র স্বামী! তা'কে অবহেলা বা পরিত্যাগ করবার উপায় তা'র কৈ? আজ তা'র বড় বেশী কোরে অলকের কথাটা মনে পড়ে। বিলাস এবং বিমাতার কথায় বিশ্বাস কোরে কত নিদারুণ ব্যবহারই সে অলকের 'পর কোরেছে। সে ভাবে বহুদিন পূর্ব্বের এক রাত্রির কথা—বিলাসের হস্তে প্রহৃত অলক যেদিন তা'র পিতৃগৃহ হ'তে বিনা দোষে বিতাড়িত হ'য়েছিল। আজো তা'র মনে পড়ে, অলকের সেই রক্তঝরা ম্লান মুখখানির কথা। সেদিন সে তা'র বিমাতার চাতুরী ধরতে পারেনি, কিন্তু এখন বুঝেছে যে, তা'র বিমাতা কত বড় শয়তানী।

আরো একটি ঘটনার কথা যখন তখন মনে প'ড়ে তা'র বুকখানাকে দগ্ধ করতে থাকে। সে ঘটনা জীবনে সে ভুলতে পারবে না। সে দৃশ্য সর্ব্ব সময়ে সে চোখের সামনে দেখতে পায়। উঃ, কি অসহ্য করুণ সে দৃশ্য!......অলক কি না শেষে তাদেরই সেই গাড়ীর তলে মর্দ্দিত হ'ল!—হায়! আজ সে কেমন আছে, কে জানে;—বেঁচে আছে কিনা সে খবরও সে রাখতে পারেনি। যদিও সে তা'র একটু খবর আনবার জন্য বিলাসকে বহু অনুরোধ কোরেছিল এবং এখনও করে, কিন্তু বিলাস তা'র সে অনুরোধ কোনদিনই রাখেনি। উপরন্তু এ জন্য সে তাড়িতই হ'য়েছে। নিজেও সাহস কোরে সে কিছু করতে পারেনি।

*　　　*　　　*　　　*

আজকাল বিলাস পুনরায় সেই পূর্ব্বের অবস্থাতেই ফিরে গেছে। মনো বন্দনার মোহে প'ড়ে যেটুকু পরিবর্ত্তন তা'র সংঘটিত হ'য়েছিল, বন্দনাকে লাভ করবার পর সে মোহটুকু কাটতে তা'র দেরী হয়নি।

বিবাহের পরে মাস ক'য়েক যেতে না যেতেই সে আবার পূর্ব্ববৎ বেশ্যালয় গমন এবং মদ্যপান আরম্ভ কোরে দিলে। ক্রমে বন্দনার উপরেও নানা নির্যাতন বর্ষিত হ'তে লাগলো। এমন কি বর্ত্তমান কারণে অকারণে স্বামীর হস্তের প্রহার হ'তেও বন্দনা বঞ্চিতা হয় না।

বিলাস রাত্রে বড় একটা বাড়ী থাকে না। যদি বা কোনদিন গভীর রাত্রে তা'র আগমন ঘটে, তাহ'লে সেদিন আর বন্দনার লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। এই ত' কয়দিন পূর্ব্বে মাতাল অবস্থায় একটা মদের বোতল ছুঁড়ে বিলাস তা'কে এমন প্রহার কোরেছিল, যার ফলে পনেরোদিন সে শয্যা ত্যাগ করতে পারেনি। এখনো তা'র কপালের কাটা দাগটা স্পষ্টরূপে মিলিয়ে যায়নি।

স্বামীর কাছ হ'তে এখন বন্দনা যতই নির্ম্মম ব্যবহার লাভ করে, ততই তা'র মনে পড়ে অলকের কথা। সে চোখের জল ফেলে আর ভাবে, একি অলকেরই অভিশাপ—? অলকের স্নেহ স্মরণ কোরে এখন তা'র প্রাণখানা হাহা কোরে কেঁদে ওঠে। তা'র মনে হয়, তেমন স্নেহ বোধ হয় জগতে কেউ আর তা'কে দেবে না। অলকের স্নেহ মধুর কণ্ঠের সেই মা' ডাকটি এখন তা'র হৃদয়ের চারিপার্শ্বে গুমরে গুমরে কেঁদে ফেরে। সে ডাক্ হয়ত' জীবনে আর সে শুনতে পাবে না। আজ অলক কোথায় আর সে কোথায়! লাঞ্ছিত, অপমানিত অলকের মলিন মুখখানি আজ তা'র বুকে বড় বেশী কোরে ব্যথা ঘনিয়ে তোলে। কিন্তু আজ আর অলককে কাছে পাবার কোন' উপায় তা'র নেই। অলককে হতাদরে সে দূরে সরিয়ে দিয়েছে—সে অলককে চিনতে পারেনি। অলকের অকৃত্রিম স্নেহের বিনিময়ে সে শুধু তা'কে দিয়েছে নিষ্ঠুর অপমান।...

(২৫)

আরো কয়টি বৎসর ধীরে ধীরে অতীতের বুকে মিলিয়ে গেল।...

হাসপাতাল হ'তে ফেরার পর অলক ছায়ার অনুরোধে এবং কাতর মিনতিতে তা'র গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সেই হ'তে সে ছায়ার গৃহেই আছে। ছায়ার বিরাট সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার এখন তা'রই উপর। ছায়া এবং সুরেশ্বরীর কাছে সে সহোদরের অপেক্ষাও বেশী স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে থাকে। তা'র কথায় তা'রা ওঠে বসে। সে যা' করবে তাই হ'বে। এততেও কিন্তু তা'র বেদনাহত প্রাণখানা তৃপ্তি পায় না—এত ভালোবাসা পেয়েও সে বন্দনার কথা ভুলতে পারেনি। ......লভ্য বস্তু মানুষকে কোনদিন তৃপ্ত করতে পারে না—দুর্লভ্য বস্তুর প্রতিই মানবের আকর্ষণ চিরদিন বেশী। তাই বোধ হয় অত' নির্যাতন পেয়েও অলক বন্দনাকে ভুলতে পারেনি। সুরেশ্বরী ও ছায়ার কাছে প্রচুর স্নেহ ভালবাসা পেয়েও তাই তা'র বন্দনাময় প্রাণ কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করতে পারেনি। দিবারাত্র নানা কাজের মাঝে মনটাকে সে ভুলিয়ে রাখতে চায়, তবু বন্দনার চিন্তা কোন' মতেই সে মন হ'তে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয় না।

ছায়া ও সুরেশ্বরী তা'র মনের গতি বোঝে, এবং সেইজন্য সর্ব্বদা

তা'কে ভুলিয়ে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিছুদিন হ'ল তা'র মনের এক গোপন অভিলাষ ছায়ার কাছে ব্যক্ত হ'য়ে পড়ায়, উৎসাহিত ভাবে ছায়া প্রভূত অর্থ সাহায্যে তা'র সে ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করবার সুযোগ মিলিয়ে দিয়েছে।

বহুদিন হ'তে অলকের প্রাণে একটা ইচ্ছা গোপনে বাসা বেঁধেছিল। সে ইচ্ছা—সমাজের পরিত্যক্তা দুঃস্থা নারীদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য এমন একটা কিছু করা, যাতে কোরে ক্ষণিক ভুলে বিপথগামিনী নারীদের আজীবন সমাজের লাঞ্ছনা বুকে ধ'রে এক মুষ্টি অন্নের জন্য অসৎ কর্ম্মের ব্রতী আর না হ'তে হয়—তা'দের যথেচ্ছাচার হ'তে মুক্ত করাই ছিল তা'র বাসনা। কিন্তু এতাবৎ সে' বাসনা তা'র মনের তলেই লুকিয়ে ছিল, তাকে কার্য্যে পরিণত করতে সে পারেনি। কারণ তা'র বাসনা অনুযায়ী কর্ম্মে যত অর্থের প্রয়োজন তা'র তা' কোন'কালেই ছিল না। সুতরাং তা'র মনের ইচ্ছা মনেই চাপা প'ড়ে ছিল—এতদিন সে সম্বন্ধে কিছু করা তা'র ঘটে ওঠবার সুযোগ পায়নি। এবার এতদিন পরে ছায়ার সাহায্যে তা'র সে ইচ্ছা কার্য্যের পথে এগিয়ে এসেছে।

ছায়ারও বিশাল সম্পত্তির কোন' উত্তরাধিকারী না থাকায় অলকের উক্ত শুভব্রতে সাহায্য করতে কোনরূপ দ্বিধা প্রকাশ করেনি। তা'রই অকাতর অর্থ সাহায্যে এবং উৎসাহে আজ অলক এক বিরাট আদর্শনীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা-করতে সমর্থ হ'য়েছে।...

ছায়ারই গৃহ সম্মুখে একটা বিস্তীর্ণ পতিত জমি ছিল, তারি উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অলকের অভিলাষিত প্রতিষ্ঠানের প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানি! প্রতিষ্ঠান ভবনের নাম করণ করা হ'য়েছে—'মাতৃ-সেবাশ্রম'।

মাতৃসেবাশ্রমের কাজ হ'চ্ছে,—যে সব নারী ভ্রম বশতঃ অসৎ পথে এসে প'ড়ে নিজের ভ্রান্তি বুঝে অনুতপ্ত হ'য়েছেন, এবং সৎপথে ফিরতে চাইলেও সমাজ যাঁদের স্থান দেয় না, তাঁদেরই জন্য 'মাতৃ-সেবাশ্রম' স্থাপন। তাঁদের মনের গ্লানি বিনষ্ট কোরে ভগবৎ শিক্ষায় উন্নত করাই মাতৃ-সেবাশ্রমের মুখ্যতর উদ্দেশ্য। অনাথ এবং পিতৃমাতৃ হীন বালক বালিকারাও এখানে স্থান পেয়ে থাকে। তাদের সুশিক্ষার দ্বারা মানুষ কোরে তোলাও সেবাশ্রমের অন্যতর কর্ম্ম। তাদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গৃহ মধ্যেই একটি বিদ্যালয়, একটি লাইব্রেরী ও পীড়াদির জন্য একটি হাসপাতাল স্থাপিত হ'য়েছে। বালক বালিকাদের দৈহিক শক্তির উন্নতি-কল্পে একটি ব্যায়ামাগারও করা হ'য়েছে।

ইতিমধ্যে উক্তরূপ বহু নারী ও বালক বালিকা সেবাশ্রমে স্থান লাভ কোরেছে। মাতৃ-সেবাশ্রমের কাজ এখন বেশ ভালো ভাবেই চলেছে। অলক, সুরেশ্বরী ও ছায়ার ঐকান্তিক চেষ্টায় মাতৃ-সেবাশ্রম দিন দিন উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের পরিশ্রমের বিরতি নেই; বিশেষ কোরে আবার অলকের।

প্রথম প্রথম মাতৃ-সেবাশ্রমের বিপক্ষে নানা মতামত নানা দিক হ'তেই বর্ষিত হ'য়েছিল, কিন্তু কার্য্যকরী হ'য়ে ওঠেনি—মাতৃ-সেবাশ্রমের উদ্দেশ্য নিবারণ করতে কেহই সক্ষম হয়নি। অলকের যুক্তির কাছে সকলকেই পরাজয় স্বীকার করতে হ'য়েছিল।

যে সমস্ত নারী সেবাশ্রমে স্থান পায় তাঁদের সকলকেই বহুবিধ কর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকতে হয়। যাতে তাঁ'রা নিজেদের অন্ন সংস্থান নিজেরাই কোরে নিতে পারেন সে বিষয় সেবাশ্রম তাঁ'দের বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

আজকাল সেবাশ্রমের নির্ম্মিত নানা শিল্পকার্য্য বাজারে বেশ সুনাম অর্জ্জন কোরেছে। সেবাশ্রমের কৃত তাঁত বস্ত্রও বাজারে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ কোরেচে। মোট কথা অলকের বাসনা এখন সম্পূর্ণ সফলের পথে।

মাতৃ-সেবাশ্রমকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার এবং সর্ব্ব বিষয়ে আরো উন্নত করার মানসে সম্প্রতি সুরেশ্বরীর পুত্র হারুকে, 'যাদবপুর টেক্‌নিক্যাল কলেজ' হ'তে ইঞ্জিনিয়ারী পরীক্ষায় পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান হ'য়েছে।

সুরেশ্বরীর কন্যা করুণারও কিছুদিন হ'ল উচ্চশিক্ষিত ও সৎপাত্রের সাথে বিবাহ হ'য়ে গিয়েছে। তা'রা স্বামী-স্ত্রীতেও সেবাশ্রমের নানা কর্ম্মে সাহায্য করে।......

বন্দনার কাণেও যে কথাটা না পৌঁছেচে এমন নয়। নানা পত্রিকার মারফৎ ও নানা লোকমুখে অলক এবং ছায়ার প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের বিষয় সে অবগত হ'য়েছে। মাতৃ-সেবাশ্রমকে একবার দেখবার আগ্রহ তা'র যথেষ্টই, কিন্তু বহু অনুনয় কোরেও সে স্বামী বিলাসের অনুজ্ঞা লাভ করতে পারেনি। ক'দিন পূর্ব্বে অত্যন্ত গোপনে সে মাতৃ-সেবাশ্রমকে শুভ-কামনা জানিয়ে একখানি পত্র দেয় আর সেই সঙ্গে একটি সোণার হার—যেটি তা'র গলায় থাক্‌ত—উপহার ও সাহায্য স্বরূপ পাঠায়। পত্রখানির শেষে এই কথাটা সে বিশেষ ভাবে লিখে দিয়েছিল যে, 'মাতৃ-সেবাশ্রমের কর্ম্মাধ্যক্ষের কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে, আমার অতি সামান্য এই সাহায্য যেন কোন'ক্রমেই প্রকাশ করা না হয়, বা সাহায্য কারিণীদের নামের তালিকাভুক্ত করা না হয়; কারণ খুব গোপনেই এ সামান্য সাহায্য আমি পাঠাচ্ছি।'...

আজ দুদিন হ'ল সে পত্রের উত্তর এসেছে, আর সেই সঙ্গে ফিরে এসেছে হারটি। পত্রে লেখা ছিল—'মাতৃ-সেবাশ্রম কোন গোপন কার্য্যের সহায়তা করে না। সেইজন্য দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আপনার এ সাহায্য গ্রহণে আমরা অসমর্থ'—

পত্রটি অলকেরই হস্তলিখিত। বন্দনা অলকের হাতের লেখা দেখেই চিনেছিল। যদিও সে পত্রের প্রতিটি বর্ণ বক্ষে তা'র তীব্র আঘাত হেনেছিল, তথাপি অশ্রুসিক্ত চক্ষুর সম্মুখে বহুক্ষণ পত্রটি রেখে, এক সময় বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে সে আপন মনে বোলেছিল,—"অলক, তুমি কি আমায় ক্ষমা করতে পার না?"…অতীতের অনেক স্মৃতিই তা'র স্মরণে সে সময় উদয় হ'য়েছিল……

(২৬)

সেদিন রাত্রি গভীর······চীৎপুরের অন্তর্গত একটা নোংরা গলির মধ্য দিয়ে অলক আসছিল। অবশ্য কোন মন্দ অভিপ্রায় তা'র ছিল না— কাজের জন্যই মাঝে মাঝে তা'কে এ পথে যাওয়া আসা করতে হয়।

ইদানীং হাসপাতাল হ'তে ফেরার পর পানদোষ সে সম্পূর্ণ ত্যাগ কোরেছে ; কারণ যেজন্য সে মদ্যপান করত এখন মাতৃ-সেবাশ্রমই তা'র সে অভাব পূর্ণ কোরেছে। বর্ত্তমানে মাতৃ সেবাশ্রমের নেশাতেই সে আপন ভোলা হ'য়ে থাকে।

চীৎপুরের এ পল্লীটায় তা'র যাওয়া আসা প্রায় থাকলেও এত রাত্রে কোনদিন এ পথে সে আসেনি। পথটাতেও তেমন আলো না থাকায় অবস্থা অন্ধকারে সে বেশ সতর্কভাবে চলেছিল। তার উপর কিছু পূর্ব্বে রীতিমত এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে যাওয়ায় পথটাকে আরো দুর্গম কোরে তুলেছিল। এখনও সম্পূর্ণরূপে বৃষ্টি থেমে যায়নি, টিপ্‌টিপ্‌ কোরে পড়ছে। অলক আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলেছিল।

সহসা তা'র অত্যন্ত নিকটে একটি রমণীর কণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো,

—"আসুন্ না"—

অলক চম্‌কে উঠলো। কণ্ঠস্বর যেন তা'র পরিচিত বোলে মনে হ'ল।

দাঁড়িয়ে প'ড়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সে আত্মগত ভাবে বল্লে,—"কে···!"

অস্পষ্ট আলোকে কিছুই দেখা যায় না। অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে সে দেখতে পেলে, তা'র দক্ষিণ পার্শ্বে একটি গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি রমণী মূর্ত্তি। তা'কে দাঁড়াতে দেখে সাহস পেয়ে রমণী আবার বল্লে,

—"আসুন্ না—এই যে, এইদিকে"—

চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে অলক তা'র দিকে এগিয়ে গেল। তা'র মনে হ'ল এ স্বরের সাথে সে যেন অত্যন্ত পরিচিত। একটি নারীর ক্ষীণ স্মৃতি তা'র মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগলো।···একি সেই?

তা'কে এগিয়ে আস্‌তে দেখে রমণী বেশ উৎসাহিত হ'য়ে উঠলো। ভাবলে, আজ আর তা'হ'লে উপবাসে কাটবে না! হাস্যমুখে সে তা'র পানে তাকিয়ে বল্লে,—"বড্ড অন্ধকার—এই, এইদিকে—আমার পেছন পেছন আসুন"—

কথার সঙ্গে সঙ্গে রমণীকে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে গম্ভীর কণ্ঠে অলক বল্লে, —"দাঁড়াও"—

এরূপ বাধা রমণী আশা করেনি। সে একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

অলক প্রশ্ন করলে,—"তোমার নাম কি?"

—"নলিনী"—

—"মিথ্যে কথা···সত্যি কোরে বলো, তোমার নাম কি? তুমি, তুমি কি বেণীবাবুর স্ত্রী—মালতী?"

রমণী শিউরে উঠলো। বহুদিন পরে আজ আচম্বিতে নিজের সত্য নামটা একজন অপরিচিত বাবুর মুখে শুনে সে রীতিমত ভীত হ'য়ে পড়লো। তা'র সর্ব্বশরীর কম্পিত হ'তে লাগলো।

অলক বল্লে,—"কথা বলছ না যে?"...

ঠিক সেই সময় এক ঝলক বিদ্যুতের আলো এসে রমণীর মুখে পড়ায় অলক দেখলে তা'র অনুমান মিথ্যা নয়—সত্যই সে মালতী! আরো একটু সরে গিয়ে অলক বল্লে,—"আমায় তুমি চিনতে পার? আমি অলক—"

সহসা সর্পের দেহে পা প'ড়ে গেলে মানুষ যে ভাবে আতঙ্কিত হ'য়ে ওঠে, ঠিক সেই ভাবে মালতী আঁৎকে উঠলো,—"য়্যা—!"

তা'র অত্যাচার অনাচারে জর্জ্জরিত দেহখানাকে অলক না ধ'রে ফেললে হয়ত' প'ড়েই যেত। ক্ষণকালের জন্য সে সম্বিৎ-হারিয়ে ফেললে। তারপর এক সময় সে ছুটে পালিয়ে যেতে গেল, কিন্তু তা'র পা' উঠলো না—সে পালাতে পারলে না। আজ প্রায় পাঁচ ছ'দিন মাত্র জল ছাড়া তা'র উদরে আর কিছুই পড়েনি। দুর্ব্বল শরীর তা'র মুহুর্মুহুঃ কেঁপে উঠতে লাগলো। সে আর দাঁড়াতে পারলে না, সেইখানেই ব'সে পড়লো। অলকের অলক্ষ্যে তা'র চক্ষে ধারার পর ধারা অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। উভয়েই নীরব। কিন্তু কতক্ষণ এভাবে থাকা যায়? জনহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থান, কিছুই দেখা যায় না। তায় আবার স্থানটার কদর্যতায় অলকের যেন শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'ল। অলক কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সম্মুখবর্ত্তী গৃহের গবাক্ষ পথে খানিকটা উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো এসে সে স্থানটাকে বেশ আলোকিত কোরে তুললো। সেই

আলোয় মালতীর অবস্থা দেখে অলকের প্রাণ ব্যথায় ভ'রে উঠলো। সে তা'র পানে তাকিয়ে দরদ মিশ্রিত কণ্ঠে বল্লে,—"তুমি এতদূর নীচে নেমে গেছ বৌদি' !"

দুই হাতে মুখ ঢেকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মালতী বোলে উঠলো,

—"না, না বৌদি' বোলে ডেকে আর আমায় লজ্জা দিয়ো না—তোমার পায়ে পড়ি এখান থেকে তুমি চলে যাও। তুমি দেবতা, তুমি এখানে থাকতে পারবে না—তোমার দম্ বন্ধ হ'য়ে যাবে—এ পাপের জায়গা! ওগো তুমি চ'লে যাও, তোমাকে আমি ডাকিনি"—

—"কিন্তু"—

—"না, না কোন' কথা নয়—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এক্ষুণি চ'লে যাও"—

—"যাব, কিন্তু তোমায় না নিয়ে ত' আমি যাব না বৌদি'! আমি বুঝতে পেরেছি তোমার নিজের ভুলের জন্য এখন তুমি অনুতপ্ত;—তোমায় ছেড়ে আর ত' আমি এখন যেতে পারব না বৌদি'—তোমায় নিয়ে তবে আমি যাব।"

—"কি বলছ তুমি! আমায় কোথায় নিয়ে যাবে? তুমি কি এখনো বুঝতে পারনি, আমি কে?

—"খুব বুঝেছি, এবং বুঝতে পেরেছি বোলেই তোমায় ছেড়ে যাব না।"

—"না, না তুমি ভুল বুঝেচ—এ পাপিনীকে কেউ আর স্থান দিতে পারে না।"

—"কেউ না পারুক, অলক ঠিক পারবে। তোমাকে এমন অবস্থায় রেখে কিছুতেই আমি যাব না।"

—"ওগো, ওসব কথা বোলে আর আমার যন্ত্রণা বাড়িও না। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চলে যাও। আমার কাছে থাক্‌লে তোমার দেহ অপবিত্র হ'য়ে যাবে। আমি কি তুমি বোধ হয় এখনো বুঝতে পারনি"—

—"পেরেছি,—তুমি আমার মা"—

—"মা!"

...মালতীর বিস্ময় সীমা অতিক্রম করলো।...অলক বলে কি? দুনিয়ার পরিত্যক্তা, ঘৃণিতা একটা ব্যাভিচারিণীকে মাতৃ সম্বোধন করতে এর ঘৃণা হ'ল না! একটা বারবনিতা, যা'কে দেহ বিক্রয় কোরে খেতে হয়, তা'র প্রতি এ করুণা দেখাতে কি অলকের সঙ্কোচ বোধ হ'ল না! অলক, অলক কি মানুষ না সত্য সত্যই দেবতা! এ পথে এসে পর্য্যন্ত কৈ কোন' মানুষের কাছে ত' মালতী এমন কথা শোনেনি। সবাই ত' স্বার্থ নিয়ে এখানে আসে যায়। এ নরক হ'তে উদ্ধার করবার কথা তা'কে কেউ ত' কোনদিন এমন কোরে দরদ দেখিয়ে বলেনি!... অতীত দিনের কতকগুলি বিশেষ স্মৃতি মালতীর অন্তরে পর পর ভেসে উঠলো। দুই হাতে অলকের পা দুটো জড়িয়ে ধরে মালতী বালিকার মত কাঁদতে লাগলো।

অলক তা'র হাত ধ'রে সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে বল্লে,

—"নাও আর দেরী কোরো না, চলো"—

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মালতী বল্লে,

—"আমায় কোথা নিয়ে যাবে? আমার মত পাপিনীকে কে স্থান"—

তা'কে বাধা দিয়ে অলক বল্লে,—"পাপ ততদিন থাকে যতদিন অনুতাপ না আসে। তোমার পাপ ত' চোখের জলে ধুয়ে গেচে বৌদি'—অনুতপ্ত যখন হ'য়েছো তখন আর তোমার পাপ নেই। চল আর দেরী কোরো না। —আমার মাতৃ-সেবাশ্রমে তুমি মায়ের স্থান অধিকার কোরে থাক্‌বে।"

মালতী আর কথা বলতে পারলে না। সে ধীরে ধীরে অলকের সাথে রাস্তায় নেমে পড়লো।

তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে।...

দিন আসে, দিন যায়। বিলাসের অত্যাচার ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠেছে—বন্দনা আর সহ্য করতে পারে না। কে জানত তা'র জীবনে এমন দিন আসবে! কে ভেবেছিল বিলাসের এত অধঃপতন ঘটবে! একদিন যাঁকে ভালবেসে বিশ্বের সকল ভালবাসাকে সে তুচ্ছ জ্ঞান কোরেছিল—দেবতার মত চরিত্র অলককে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিল—কে জানত সেই তা'কে হাতে পেয়ে এমন তিলে তিলে দগ্ধ করবে।

কত সুখের কল্পনাই সেদিন তা'র প্রাণে শিহরণ দিয়ে যেত। সে ভাবত, বিলাসকে পতিত্বে বরণ করতে পারলে জীবন তা'র ধন্য হ'য়ে যাবে! বিলাসের কত বড় বাড়ী, কত অর্থ, দাস দাসী কত—সে সবের সে হবে অধিশ্বরী—বিলাসের মত সুন্দর, শিক্ষিত পুরুষ হবে তা'র স্বামী!...কত আনন্দ! হায়! সে আনন্দ আজ তা'র চূর্ণ হ'য়ে গেছে—বিলাসকে সে চিনতে পেরেছে। বিলাসের সে বাড়ী আর নেই, সে অর্থ নেই, সে সব দাস দাসী বিদায় নিয়েছে—দেনার দায়ে সবই একে একে চলে গেছে। যায়নি সুধু সে। জীবন-মরণে সে যে বিলাসের কেনা, তা'র ত' কোথাও যাবার উপায় নেই। বিলাসের পায়ের তলে যেমন কোরেই হোক একটু আশ্রয় কোরে তা'কে থাকতে হবে। কিন্তু এ থাকাও বুঝি তা'র আর চল্‌লো-না।

বিবাহের পর মাত্র তিনটি মাস সে বিলাসকে পূর্ণভাবে কাছে

পেয়েছিল। সেই তিনটি মাসের স্মৃতিই এখন তা'র বেদনাহত জীবনের সম্বল। তারপর হ'তেই তা'র জীবনে ঘনিয়ে আসে বিষাদের দিন। বিলাসের সহসা সেই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে সেদিন সে ভেবেছিল, অলকেরই অভিশাপ এর কারণ। যে দুঃখ অলককে সে দিয়েছে, ভগবান তার শাস্তি তা'কে এইভাবে মিলিয়ে দিলেন। সেই হ'তে অত্যাচারী স্বামীর নির্ম্মম অত্যাচার, নিষ্ঠুর ব্যবহার সয়ে সয়ে আজ সে অসমর্থ হ'য়ে পড়েছে। তবুও কিন্তু স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা সে হারিয়ে ফেলেনি। এখনো সে বিলাসকে পূর্ব্বের মত ভক্তি করে। বিলাসের নিগ্রহ তা'র বুকে তীব্র শেল হানলেও, হেলার দৃষ্টিতে সে বিলাসকে আজো দেখতে পারে না। বিলাসের প্রতি তা'র প্রেম যে কত সুগভীর তা' সুধু সেই জানে,—সুস্থির মতি বিলাসের পক্ষে তা' চিন্তা করাও কঠিন। বিলাসের দিক্ হ'তে সে যতই ব্যথা পায় ততই যেন আরো সে তা'কে আঁকড়ে ধরতে চায়। আজ সে ভাবে, কে জানে, অলকেরও হয়ত' ঠিক এমনিই হ'ত! —আজ তা'র মনে পড়ে সুরেশ্বরীর ভবিষ্য বাণী,—মনে পড়ে তা'র উপদেশ। বিলাসের প্রেমে অন্ধ হ'য়ে সকল কিছুই সে দলিত কোরে এসেছে। সে সব কথা মনে পড়ে ব্যথার অশ্রুতে তা'র বক্ষবাস সিক্ত হ'য়ে যায়।······দিনের পর দিন স্বামীর প্রাণহীন নির্য্যাতন সহ্য কোরে কোরে ক্রমে তা'র শরীর রুগ্ন হ'য়ে পড়েছে। প্রহারে প্রহারে তা'র শরীর ক্ষত বিক্ষত। সে সুন্দর লাবণ্য তা'র নষ্ট হ'য়ে গেছে। অতি সুন্দর মুখখানা তা'র আজ বিষাদের কালিমা লিপ্ত। লোক সমাজে বেরুতে আজ সে লজ্জা পায়—ভয় হয়—যদি কেউ তা'র প্রহার-জর্জ্জর দেহখানা লক্ষ্য কোরে কোন' প্রশ্ন করে?······

বারবনিতার গৃহে, শুঁড়ীর দোকানে, জুয়ার আড্ডায় বিলাসের সর্ব্বস্ব বাহিত হ'য়েছে। বাস ভবনটীও বিক্রীত। এখন সহরের প্রান্তে একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটি গৃহের নীচের তলায় একখানা সামান্য ঘর ভাড়া কোরে সে বন্দনাকে রেখেছে। নিজে সে থাকে না—কোথায় থাকে তাও সে ছাড়া আর কেউ জানে না। বাসায় সে কমই আসে, এবং যখন আসে তখনই সুরু হয় বন্দনার উপর নানা অত্যাচার। নীরবে নত বদনে বন্দনা সে সব সহ্য করে।

একরূপ একাই বন্দনাকে বাসায় থাকতে হয়; মাসের মধ্যে দুদিন যদি স্বামী তা'র কাছে থাকে ত' যথেষ্ট। অন্ন উদরে কোনদিন যায়, কোনদিন যায় না। বেশীর ভাগই তা'র উপবাসে কাটে। অনাহারে, অত্যাচারে দেহ তা'র ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'য়ে পড়েছে। বেদনার ভার আর সে বইতে পারে না।

একটা অত্যন্ত তুচ্ছ জীবও অবিরত কারণহীন অত্যাচার পেতে পেতে এক সময় বেঁকে দাঁড়ায়—শক্তি মত রোষ প্রকাশ করতে ছাড়ে না; বন্দনা ত' মানুষ তা'র আর কত সহ্য হবে! স্বামীর পীড়ন তা'র সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বিলাসের কুকর্ম্মের প্রতিবাদ আজকাল সে অল্প বিস্তর করতে আরম্ভ কোরেছে। যা'র ফলে নিগ্রহও তা'র বেড়েছে শতগুণ। সেদিনও তেমনি এক কারণে নিগ্রাহক স্বামীর নিগ্রহ তা'কে গৃহ হ'তে বিতাড়িত কোরে দিলে।

রাত্রি তখন অনেক হ'য়েছে। বেদনার ঘাত প্রতিঘাতে ক্লান্ত অবসন্ন দেহ মন নিয়ে বন্দনা অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছিল। সে একাকীই ঘরে ছিল, স্বামীর আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। নিশ্চন্ত মনেই সে

ঘুমাচ্ছিল। সহসা একটা গোলমালে তা'র ঘুমটা ভেঙে গেল। সে শুনলে, বাইরে বাড়ীওয়ালার সাথে বিলাসের ঝগড়া বেঁধে গেছে। বিলাস উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কোরে বলছে,

—"বেশ কোরবো চেঁচাব, তোর তাতে কি রে শালা? আমার বৌকে আমি ডাকব, তাতে তোর কি? তুই বলবার কে? ওর নাম কি, দস্তুরমত ভাড়া দিয়ে আমি থাকি—যা' খুসী আমার তাই কোরবো"—

বাড়ীওয়ালাও তা'র অনুকরণে সপ্তমে কণ্ঠ তুলে বল্লে,

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভাড়া যা দেন তা' আর কথায় কাজ নেই—পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী, এক পয়সা দেবার নাম নেই আবার রোয়াবী! ওসব চালাকী এখানে খাটবে না—কাল সকালে কড়ায় গণ্ডায় আমার ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া চাই, নইলে দেখাব মজা—

—"কি আমায় মজা দেখাবি? ওর নাম কি, জানিস্ আমি কে?"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি, জোচ্চোর মাতাল একটা কোথ্‌ থেকে এসে জুটেছে আমার বাড়ীতে!"

—"চুপরাও শালা"—

—"এই খবর্দ্দার বল্‌ছি—শাল-গালি কর্‌লে এক্ষুণি পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব। ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাতলামো করতে লজ্জা করে না?...বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে, অমন ভাড়াটেতে আমার কাজ নেই;—ছোটলোক, মাতাল কোথাকার!"

বিলাস পূর্ব্ববৎ চীৎকার কোরে উঠলো,—"দরজা খুল্‌বে কি না বলো?"

—"না, খুলবো না—এটা ভদ্রলোকের বাড়ী, মাতালের মাতলামি করবার জায়গা নয়।..."

কথা শেষে বাড়ীওয়ালা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

সদর দরজা রুদ্ধ থাকায় এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েই বিলাস উপরের বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান বাড়ীওয়ালার সাথে ঝগড়া করছিল। বাড়ীওয়ালা অন্তর্দ্ধাণ হ'তেই বিলাস ক্ষেপে উঠলো। কি করবে ভেবে পেলো না।

এমন সময় বন্দনা দরজা মুক্ত কোরে তা'কে বল্লে,

—"এসো, ভেতরে এসো"—

সহসা বিলাসের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো বন্দনার উপর। তা'র জন্যই ত' এত কাণ্ড, সে যদি ডাকামাত্র দোর খুলে দিত তাহ'লে কি আর এত কাণ্ড হয়! বিলাস গৃহের চৌকাঠে পা' দিয়েই, কোন কথা না বোলে বন্দনার পেটে সজোরে একটা লাথী বসিয়ে দিলে।

—"বাবা গো"—

বন্দনা দুই হাতে উদর চেপে ধ'রে সেইখানে লুটিয়ে পড়লো। তা'র কথার প্রতিরব কোরে বিলাস বল্লে,

—"বাবা গো!...তোর জন্যেই ত' এত গোল্—এত কথা আমায় শুনতে হ'ল। এতক্ষণ দোর খুলে দিস্‌নি কেন? কি কচ্ছিলি বল্?"

যন্ত্রণার বেগটা সামলে নিয়ে বন্দনা দাঁতে দাঁত চেপে অত্যন্ত ঝাঁঝের স্বরে বল্লে,

—"করবো আর কি—ঘুমুচ্ছিলুম! তোমার মাতলামি দেখবার জন্যে ত' আর কেউ রাত জেগে ব'সে থাকবে না।"

বিলাস গর্জ্জন কোরে উঠলো,

—"আলবৎ থাকবে—তুই ত' ছেলেমানুষ, তোর বাবা থাকবে"—

—"দেখ, বাপ. তুলে কথা বোলো না বলছি"—

—"বেশ, কোরবো বোলবো, একশো বার বোলবো—কি করবি তুই ? ······বলে', যা'র ধন, তা'র ধন নয় ওর নাম কি, নেপোয় মারে দই ! আমার ঘর, আমিই শালা রস্তোয় দাঁড়িয়ে চেঁচাব—আর, ওর নাম কি, উনি মজা মেরে ঘরে শুয়ে ঘুমুবেন ! একি তোর বাবার ঘর পেয়েছিস্ ?"

বন্দনা একবার কট্‌মট কোরে তা'র পানে তাকালে, কোন কথা বল্‌লে না। বেশী কথা বলবার মত অবস্থাও তখন তা'র ছিল না। একে পেটের দারুণ যন্ত্রণা, তায় আবার বিলাসের মুখের উগ্র মদের গন্ধে তা'র যেন দম বন্ধ হবার উপক্রম হচ্ছিল। তা'র ঐরূপ চাউনি দেখে বিলাস রাগে ফেটে পড়লো। কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব উচ্চে তুলে সে বল্লে.—

"কি আমাকে চোখ দেখানো ! দয়া কোরে ঘরে রেখেছি, ওর নাম কি, তুই আমায় আবার চোখ দেখাস কোন সাহসে রে বাঁদ্‌রী ?"

বন্দনা সঙ্গে সঙ্গে বল্লে.—"দয়া কোরে আবার কি···বিয়ে কোরেছ মনে নেই ?"

—"তোর বাবার ভাগ্যি যে তোকে বিয়ে কোরেছি। ওর নাম কি, তোর মত বৌ আর আমার দরকার নেই,—তুই দূর হ'—"

—"দূর হব না, কি করবে ?"

—"দেখবি কি কোরবো"—

বন্দনার ভূলুণ্ঠিত দেহের 'পরে উপর্য্যুপরি আরো কয়টা লাথী বসিয়ে দিয়ে সে বল্লে,—"কেমন, দেখলি ?"...পা' দিয়ে বন্দার অচৈতন্য প্রায় দেহটা ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে গৃহের বার কোরে দিয়ে সে বল্লে,—"এবার দূর হ'স্

কি না হ'স্ দেখি একবার।"...সশব্দে সদর দরজা বন্ধ কোরে, সে ভিতরে নিজের ঘরে চলে গেল।

সেই গভীর রাত্রে নির্জ্জন রাজপথে মূর্চ্ছিতা বন্দনা কতক্ষণ পড়ে রইলো কে জানে!......

(২৮)

প্রভাতের তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। রজনীর মন অন্ধকারের বুকে বুক বেঁধে তখনও বসুধা নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাচ্ছিল। নক্ষত্র বঁধুদের উজ্জ্বল দৃষ্টি তখনো ম্লান হ'য়ে আসেনি।...

মাতৃসেবাশ্রমের মাতাগন এবং বালক বালিকারা তখন গাঢ় ঘুমে অচেতন। সেবক-সেবিকাদের মধ্যেও কেবল মাত্র অলক ব্যতীত আর কেউ জাগরিত ছিল না। হৃদয় জোড়া বেদনার বোঝা নিয়ে শুধু একা অলকই তখনও বিনিদ্র ছিল। এমন নিদ্রাহীন ভাবে প্রায়ই তা'র কেটে যায়। পুরাণ দিনের সহস্র স্মৃতি বহ্নি তা'র মর্ম্মতল দগ্ধ কোরে দেয়। ব্যথার অকুল পাথারে অতীত চিন্তার তরণীখানি ভাসিয়ে দিয়ে এমনি কোরে কত রাত্রিই সে কাটিয়ে দেয়। তা'র চির বঞ্চিত প্রাণ অতৃপ্ত ক্ষুধায় হাহাকার কোরে মনের তলে গুম্‌রে কাঁদে।—

পেয়েছে সে অনেক—এত পাওয়া হয়ত' তা'র কল্পনার বাইরে ছিল। অনেকে এই পাওয়ার জন্যেই হয়ত' ব্যাকুল। ছায়া, সুরেশ্বরী এবং মাতৃসেবাশ্রম তা'কে যা' দিয়েছে তার তুলনা হয় না। অধুনা মালতীরও তা'র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অল্প নয়। পাপের পঙ্কিল পথ হ'তে টেনে এনে অলক তা'কে এখন যে গৌরবের পদে সম্মানিত কোরেছে,

এমন সম্ভাবনার কথা স্বপ্নেও কোনদিন সে ভাবতে পারেনি। অলকের শিক্ষায়, অলকের দিক্ষায় তা'র মনের কালিমা আজ বিনষ্ট। পবিত্রতার স্পর্শে সেও পবিত্র হ'য়ে উঠেছে। কাজেই মালতী দেবতার মতই অলকে এখন শ্রদ্ধা করে।

সর্ব্বহারা জীবনে এত শ্রদ্ধা, সম্মান, ভক্তি, ভালবাসা লাভ কোরে অলকের আনন্দিত হওয়াই উচিত ছিল; কিন্তু সে তা' হয়নি। সহস্রাধিক তারকা আকাশের বুকে জেগে থাকা সত্বেও চন্দ্রের অভাবে ধরণীতল যেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে—বহু পুত্র বক্ষে পেয়েও জনক-জননীর প্রাণ যেমন একটি হারা পুত্রের জন্য সংসারের সব কিছুই শূন্য জ্ঞান করে, তেমনি এত পেয়েও বন্দনার অভাবে অলকের হৃদয়ের রিক্ততা গেল না। বন্দনার চিন্তা মন হ'তে নির্ব্বাসিত করতে কোন' মতেই সে সমর্থ হ'ল না। অনেকবার সে ভেবেছে এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা কোরেছে যে, বন্দনার কথা আর সে চিন্তা কোরবে না। কেন করবে? নিষ্ঠুরা বন্দনা তা'কে কি দিয়েছে? তা'র অন্তর ও বাইরের সকল কিছু হরণ কোরে কেবল মাত্র প্রতিদান দিয়েছে নিদারুণ বেদনা! কন্যা স্নেহে, মাতৃত্বের সম্মানে যাকে সে জীবনের শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি নিবেদন কোরেছিল, তা'র কাছে সে পেলো কি? ঘৃণা, অপমান, অবহেলা! তবে কিসের জন্য সে তা'কে ভাববে? কেন তা'র জন্য এত হাহুতাস?... না, সে আর তা'কে ভাববে না। ভগবান করুণ, সে সুখী হোক্, আনন্দ পাক্, রাজ-রাণী হোক!—অলক আর তা'র চিন্তা করবে না—সে এবার শক্ত হবে।

কিন্তু মুখে সে শক্ত হ'তে চাইলেও, অন্তর হ'তে সে বন্দনার চিন্তা

দূর করতে পারলে না। হয়ত' কিছুটা পরিমাণ সে পারত, যদি শুনত বন্দনা সুখী হ'য়েছে।...

হাসপাতাল হ'তে ফেরার পর যখন সে বিলাসের হস্তে বন্দনার উৎপীড়নের কথা শুনেছিল তখন সে চোখের জল চাপতে পারেনি বন্দনাকে দেখ্‌তে যাবার ইচ্ছা অনেক বারই তা'র হয়েছিল অভিমান সুধু তা'কে সে কাজ করতে দেয়নি।

দিবারাত্র তা'র মুখে বন্দনার নাম শুনে শুনে মাঝে মাঝে সুরেশ্বরী বল্লে,

—"ঢের ঢের ছেলে দেখেছি বাবা এমন মা ক্যাঙলা ছেলে আবার কক্ষনো দেখিনি। ঐ মা, মা কোরে সর্ব্বস্ব গেল, তবু সেই মা—"

অলক একটু ম্লান হাসি হেসে বল্লে,

—"একটা কথা আছে জানত' দিদি—কুমাতা যদ্যপি হয় কুপুত্র কখনো নয়! অবশ্য কথাটা আমি আমার মত কোরে বল্লুম কথাটা হ'চ্ছে—কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনো নয়! কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে, আমার আগের কথাটাই ঠিক।"

ছায়া মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ কোরে বল্লে,

—"হুঃ! ঐ মা, মা, কোরেই তুমি মরবে অলকদা', এই আমি বোলে দিলুম!"

—"তাহ'লে সে মরণ আমার খুব শান্তিরই হবে। মায়ের জন্যে ছেলে মৃত্যু বরণ কোরেছে বোলে কি কখনো শুনেছ ছায়া?...এই আমিই হব পৃথিবীর এক নব উদাহরণ—মায়ের জন্যে মরতে পেরে।"

...ছায়ার পানে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে অলক ঐরূপ বলে। অলক্ষিত বিধাতাও হয়ত' সে কথাটা শুনে মনে মনে হেসেছিলেন!

মোট কথা বন্দনাই এখন অলকের সর্ব্ব অন্তর জুড়ে বসে আছে। সকল আলোচনার মধ্যেই বন্দনা, সকল কর্ম্মের মধ্যেই বন্দনা, সকল চিন্তার মধ্যেই বন্দনা। গোপনে বন্দনার সংবাদ সে নেয়। বন্দনার দুঃখের সমাচার শুনে তা'র বুক ফেটে যায়! বিলাসের বর্ব্বরের ন্যায় আচরণ যত সে শোনে ততই ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। তা'কে শাস্তি দেবার জন্য তা'র দেহের রক্ত টগ্-বগ্ কোরে ফুটে ওঠে। ছলনায় একটা সরল বালিকার অন্তর জয় কোরে—তা'কে বিবাহ কোরে, এখন তা'র প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার! অলক ভাবে, এর জন্য সে বিলাসকে সমুচিত শিক্ষা দেবে। তা'কে সে জিজ্ঞাসা করবে, কেন সে তা'র স্নেহের বন্দনাকে এত কষ্ট দেয়? যদি সংস্থান নেই, তবে কেন সে বিবাহ কোরেছিল? কেন সে তা'র মরুময় জীবনের একমাত্র স্মৃতির আধারকে নির্ম্মম নির্যাতনে তিলে তিলে দগ্ধ করছে? কোন অধিকারে সে তা'র মায়ের দেহে হাত তুল্‌তে সাহস পায়? মাঝে মাঝে উন্মত্তবৎ সে ভাবে, বিলাসকে খুন করবে, খুন কোরে ফাঁসী যেতে হয় তাও সে যাবে—তাতেও তৃপ্তি। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা তা'র দূর হ'য়ে যায়...বিলাস যে বন্দনার স্বামী, বন্দনা বিলাসকে ভালবাসে, বিলাসের অনিষ্টে তা'র বন্দনারই যে অনিষ্ট। এ কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা'র সমস্ত রাগ কোথায় তলিয়ে যায়; বিলাসের শুভ কামনায় চিত্ত ভোরে ওঠে '...আচ্ছা বিলাসকে সৎপথে আনবার কি কোন উপায় নেই? তাহ'লে তা'র বন্দনা ত' সুখী হ'তে পারে! নিজের প্রাণ দিয়েও যদি সে বন্দনাকে সুখী করতে পারে, তাতেও ত' সে প্রস্তুত! মালতীকে সে সৎপথে আনতে পেরেছে, বিলাসকে কি কোনরূপে পারবে না? সে আপন মনে প্রতিজ্ঞা করে, বিলাসকে ভালো কোরবেই!—

আজও বিনিদ্র অলক বসে বসে সেই চিন্তাই করছিল,—কেমন কোরে বিলাসের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা যায়।

সেই সঙ্গে আরো ভাবছিল, তা'র জীবন নাট্যে অভিনীত দৃশ্যগুলির কথা। সেই পিতার মৃত্যু—জননীর ক্রন্দন—পিতৃব্যের নির্দ্দয় ব্যবহার। তারপর গ্রাম ত্যাগ কোরে তা'র কলিকাতায় আসা এবং কর্ম্ম সমুদ্রে ঝম্প প্রদান। জননীকে খুসী করবার প্রাণপণ চেষ্টা—জননীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে তা'র সেই ব্যাকুলতা।—দ্বারে দ্বারে একটু স্নেহের জন্য তা'র সেই কাঙাল-পনা। তারপর সেই বন্দনার দর্শন লাভ থেকে আরম্ভ কোরে আজ পর্য্যন্ত যা' কিছু অঘটন তা'র জীবনে ঘটেছে সবই তা'র মানস পটে একে একে ভেসে উঠতে লাগলো।

নানা চিন্তায় চিন্তিত অলক আপন অজ্ঞাতে কখন এসে বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সুন্দর নীলিমার পানে তাকিয়ে চিন্তাহত চিত্তে একসময় সে তা'র ব্যথিত প্রাণের শান্তি প্রলেপ সেই সঙ্গীতকে স্মরণ কোরে সহসাই গেয়ে উঠলো,—

…"যতবার আলো জ্বালাতে যাই
নিভে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে
যে লতাটী আছে, শুকায়েছে মূল
কুঁড়ী ধরে শুধু, নাহি ফোটে ফুল—
আমার জীবনে তব সেবা তাই
বেদনার উপহারে।"—

গাইতে গাইতে তা'র গণ্ড বেয়ে দর দর ধারে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো। ব্যথার চিত্ত উজাড় কোরে সে গেয়ে চল্‌লো.—

"পূজা গৌরব, পুণ্য বৈভব
কিছু নাই, নাহি লেশ,
এ তব পূজারী পরিয়া এসেছে
লজ্জার দীন বেশ।—
উৎসবে তা'র আসে নাই কেহ,
বাজে নাই বাঁশী সাজে নাই গেহ
কাঁদিয়া তোমারে আনি তবু ডাকি
ভাঙ্গা মন্দির দ্বারে॥"...

প্রাণের হাহাকার গানখানির মধ্যে ঢেলে দিয়ে অনেক বার সে একটানা গানখানি গেয়ে গেল। চিত্তের সমুদয় বেদনা সে বুঝি ঐ গানের মধ্যেই উজাড় কোরে দিতে চাইছিল। নৈশ অন্ধকারের বুকে তা'র সঙ্গীতের ধ্বনি আছাড় খেয়ে ফিরতে লাগলো। গানটি থেমে যাবার পরও বহুক্ষণ বাতাসে বাতাসে তা'র সুরের মূর্চ্ছনা কাঁদন তুলে ফিরতে লাগলো। তারপর ধীরে ধীরে কোন্ দূর দূরান্তরে ভেসে চলে গেল।—

আরো কিছু সময় স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর অশ্রুসিক্ত চক্ষুদুটি মুছে নিয়ে অলক ভাবলে, রাত্রি শেষ হ'য়ে এলো, এবার সে একটু বিশ্রামের জন্য শয্যার আশ্রয় নেবে।

কিন্তু ঠিক সেই সময় সেবাশ্রমের বহির্দ্বারে কার অস্পষ্ট করাঘাত শোনা গেল। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে সে আপন মনে বল্লে,—"না, ভুল ত' নয়—নিশ্চয়ই কেউ কপাট ঠেল্‌ছে!".. বাইরের বারাণ্ডায়

বেরিয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে,—"কে ? কে ডাকে ?"···কোন' সাড়া পাওয়া গেল না। আবার জিজ্ঞাসা করলে,—"কে ?"···

এবার অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এলো,—"আমি"—

"কে !"...বারাণ্ডার রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়তেই অলক দেখলো. সেবাশ্রমের দরজার সামনে একখানা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে, আর একেবারে দরজাটা ঘেঁসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারী মূর্ত্তি ! বিস্মিত অলক আস্তে আস্তে নীচে নেমে গিয়ে দরজাটা মুক্ত কোরে দিতেই যে মূর্ত্তি তা'র নয়ন পথে পতিত হ'ল, এভাবে সে মূর্ত্তিকে দেখ্‌বার কল্পনাও সে কোনদিন করতে পারেনি। অসীম বিস্ময়ে তা'র কণ্ঠে আপনা হ'তেই উচ্চারিত হ'ল,

—"একি, মা !"—

চক্ষুদুটি উত্তমরূপে মুছে নিয়ে দণ্ডায়মানা নারী মূর্ত্তিটিকে আর একবার সে ভালো কোরে দেখলে।···না, ভুল ত' হয়নি—এ বন্দনাই ত' ! বন্দনার আপাদ মস্তকে আরো একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে সে বল্লে,

—"কিন্তু, তুমি এ সময় কোথা থেকে মা ?"

আনত মুখী বন্দনা কি একটা কথা বলতে গিয়ে পারলে না। অলকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে, সে তা'র পায়ের কাছে ব'সে পড়লো। ..

(২৯)

বন্দনাকে তা'র অভাবনীয় আগমনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরে যখন অলক বুঝলে, সে' প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সে অনিচ্ছুক তখন আর কোন প্রশ্ন না কোরে এবং তা'র আগমনের প্রকৃত হেতুটা অনুমান কোরে অলক তা'কে ভিতরে নিয়ে যায়। সেই হ'তে বন্দনা মাতৃ-সেবাশ্রমেই আছে।

সেবাশ্রমের বিরাট অট্টালিকা, আশ্রিতা মাতাগণকে ও অনাথ বালক-বালিকাদের দেখে বন্দনার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। এতখানি সে ভাবতে পারেনি। সেবাশ্রমের অতি সুন্দর কর্ম্ম-রীতি ও শিক্ষা নীতিও তা'র যথেষ্ট আনন্দ বর্দ্ধন কোরেছিল। কিন্তু সর্ব্বপরি তা'র আশ্চর্য্য লাগে সেবাশ্রমের অন্যতম কর্ত্রী বা সেবিকা হিসাবে সেস্থানে মালতীর আশাতীত দর্শন লাভ কোরে! প্রথমটা সে নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করতে পারেনি। তারপর মালতীরই মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে অলকের প্রতি শ্রদ্ধায় তা'র চিত্ত ভোরে উঠলো। সে ভাবলে, এমন যা'র মহৎ প্রাণ তা'র প্রতি কি নিষ্ঠুর আচরণ না সে কোরেছে! সেই কারণেই হয়ত' ভগবান তা'কে আজ এই শাস্তি দিচ্ছেন। তাঁ'র রাজ্যে ত' অবিচার নেই—মহৎ ব্যক্তির প্রতি অসম্মান তাঁ'র বিচারে সহ্য হবে কেন! সেই শাস্তিতেই আজ হয়ত' তা'র চক্ষের জল শুখায় না। সে আরো ভাবলে,

অলকের ক্ষমাগুণের কথা। নিষ্ঠুর ভাবে যা'রা তা'র জীবনখানা দলিত কোরে দিয়েছে, তা'রাই আবার যেমন তা'র কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, অমনি তাদের সকল দোষ, সকল অপরাধ ক্ষমা কোরে সে বুকে টেনে নিয়েছে।

অলককে দেখে এখন বন্দনার মনে হয় তা'র পায়ে মাথাটা লুটিয়ে দিতে। নিজ কৃত আচরণের ক্ষমা চেয়ে নিতে। অনেক বারই সেজন্য সে অলকের কাছে এগিয়ে গেছে, কিন্তু পারেনি। কোথায় যেন তা'র বেধেছে।...কেমন কোরে সে তা'র পূর্ব্ব ব্যবহার অলকের কাছে উত্থাপন করবে? কেমন কোরে সে বলবে, অলক তুমি আমার পূর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করো?—সে অপরাধের কি ক্ষমা আছে যে সে তাই প্রার্থনা করবে?

এখন অলকের সাথে কথা বল্‌তেও যেন তা'র সঙ্কোচে রীতিমত বাধে। পূর্ব্বের ন্যায় সে আর তা'র চোখে চোখ রেখে কথা বল্‌তে পারে না। তা'র কাছ হ'তে একটু দূরে দূরেই সে থাক্‌তে চায়। অলক তা'র সাম্‌নে এসে কথা বল্‌লে অথবা তা'কে কাছে ডাক্‌লে সে যেন লজ্জায় এতটুকু হ'য়ে যায়, অপরাধিনীর মত জড়সড় হ'য়ে সে তা'র সামনে দাঁড়ায়।

ছায়া, সুরেশ্বরীর মুখের পানেও সে সাহস কোরে তাকাতে পারে না। আজ তাদের চেয়ে সে অনেক নীচে। ছায়ার প্রতি তা'র পূর্ব্ব সন্দেহ স্মরণ করলে এখন নিজের 'পরে নিজেরই ঘৃণা হয়। ছায়া দেবী তাই সে দেব চরিত্র অলককে ভ্রাতৃরূপে কাছে পেয়েছে। শত কুৎসা, শত নিন্দা সহ্য কোরেও তাই সে তা'র মত কোরে অলককে পরিত্যাগ

করেনি। তাই আজ অলকের কৃপায় এবং দেবতার আশীর্ব্বাদে তা'র দেশজোড়া খ্যাতি—মাতৃ-সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী বোলে তাই আজ তা'র সম্মানের অন্ত নেই। পয়সা ত' অনেকেরই আছে, ব্যয় করেও সকলে. কিন্তু এমন সৎপথে ক'জন ব্যয় কোরেছে? ছায়ার পক্ষে এ ব্যয় ত' আজ সুধু অলকের জন্যই সম্ভব হ'য়েছে! যে অলককে একদিন সে ঘৃণায় দূর কোরে দিয়েছে, সেই অলকেরই প্রাণে এতবড় উদ্দেশ্য ছিল! সাধারণে যা ভাবতেও পারে না!···সুরেশ্বরী অলককে চিনেছিল তাই অলকের অখ্যাতি কোন' দিন সে সহ্য করেনি। ছায়া এবং সুরেশ্বরীর সঙ্গে অলককে হেসে কথা বল্‌তে দেখলে এখন সে অন্তরে ব্যথা পায়। ভাবে, এমনি কোরে অলক তা'র সঙ্গেও হেসে কথা বলত, তা'র সঙ্গে কথা বোলে এর চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ একদিন অলক পেতো; কিন্তু আজ নিজেই সে দূরে সরে গেছে। যদিও অলক এখনো ঠিক পূর্ব্বের মতই তা'কে মা' বোলে ডাকে এবং অসঙ্কোচে তা'র সাথে কথা বার্ত্তা বলে—যেন কোন'দিন কিছু হয়নি এমনি ভাবে—তবুও সে যেন কোথায় একটা মস্ত অভাব অনুভব করে। অবশ্য এটা যে তা'রই মনের সঙ্কীর্ণতা তা' সে বোঝে।......

এইরূপ নানা চিন্তার মধ্য দিয়ে দিন তা'র অতিবাহিত হয়। সল্প কয়েকদিনের মধ্যে তা'র মনের অবস্থা উপলব্ধি কোরে, অলক তা'কে কর্ম্মের মধ্যে জড়িয়ে রেখে তা'র দুর্ভাবনা দূর করবার জন্য সেবাশ্রমের একটি বিশেষ সম্মানের আসন তা'র জন্য নির্দ্দিষ্ট কোরে দেয়।

'মাতৃ-সেবাশ্রমের অনেক কাজই এখন তা'কে করতে হয়। কাজের ভেতর দিয়ে কেমন কোরে রাত্রি দিন কেটে যায় সে জানতেও পারে না।

সকলের মুখেই তা'র প্রশংসা, সকলের কাছেই সে সম্মান পায়—ভালবাসা পায়। বিশেষ কোরে অলকের স্নেহ ভালবাসা তা'কে যেন নব জীবন দান কোরেছে। অলকের ভালবাসা এখন তা'র যত মিষ্টি লাগে এমন মিষ্টি পূর্ব্বে কখনো লাগেনি। হারিয়ে পাওয়ার আনন্দ বোধ হয় এমনই হ'য়ে থাকে!—

এত পেয়েও কিন্তু তা'র শান্তি নেই। কিসের একটা দারুণ অভাবে এত পাওয়ার মধ্যেও অন্তর তা'র রিক্ততায় ছেয়ে আছে। দেহের লাবণ্য নেই, মুখের হাসি নেই, সর্ব্বদাই তা'র মন যেন চিন্তাভারাক্রান্ত।—এতদিনের ভিতর বিলাসের তেমন কোন খবর সে পায়নি।

মাঝে একবার সন্ধান কোরে বিলাস সেবাশ্রমে তা'র খোঁজে এসেছিল, এবং অলকের উপর অকথ্য ভাষায় নানা গালাগালি বর্ষণ কোরে চলে যায়। বন্দনাকে স্থান দেওয়ার জন্য অলককে সে জেলে পাঠাবে বোলেও শাসিয়ে যায়। অলক কিন্তু তা'র সে কথায় রাগ না কোরে বেশ হাস্‌তে হাস্‌তেই বোলেছিল,

—"মা'কে স্থান দেবার অপরাধে ছেলের কখনো জেল হয় না বিলাসবাবু। আপনি যা পারেন করবেন। আমার মা যখন আমার কাছে এসেছেন তখন তাঁ'কে আর কোন মতেই আমি আপনার মত একটা বর্ব্বরের সঙ্গে ছেড়ে দেব না। যদি কোন দিন আমার মায়ের যথার্থ মর্য্যাদা দিতে পারেন, সেদিন আসবেন—তার আগে নয়। তবে আমার মা যদি স্বেচ্ছায় আপনার সঙ্গে যেতে চান, তাহ'লে তাঁ'কে বাধা দেবার অধিকার আমার নেই।—আপনি পারেন ত' আমায় জেলেই দেবেন।"...

সে কথার পর সেই যে বিলাস রাগে গর-গর করতে করতে চলে গেছে, আজ পর্য্যন্ত আর তা'র কোন খবর পাওয়া যায়নি।

বন্দনা গোপনে তা'র খবর নেবার বহু চেষ্টা কোরেছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি—তা'র সংবাদ সে সংগ্রহ করতে পারেনি।—

(৩০)

ক্রমে একটি বৎসর অতীত হ'ল। বন্দনা মাতৃ-সেবাশ্রমেই আছে। ব্যথিত মনের অসংযত চিন্তা রাশিকে সংযত কোরে রাখবার জন্য দিবারাত্র সে নিজেকে নানা কাজের মধ্যে জড়িয়ে রাখ্‌তে চায়। কিন্তু পারে কি? মনের অধীর ধারাকে বেঁধে রাখতে সে পারে না। বিলাসের চিন্তা সর্ব্বদাই তা'র মনটাকে আচ্ছন্ন কোরে রেখে দেয়। সে ব্যাকুলতাকে দূর করতে কোন মতেই সে সমর্থ হয় না।

এই দীর্ঘ একটা বছর তা'র কি ভাবে কাটছে তা' শুধু সেই জানে। সকল কর্ম্মের মধ্যে, সকল কথার মধ্যে, সকল কিছুরই মধ্যে কি বিরাট শূন্যতা, কি ভীষণ বেদনা যে সে অনুভব করে তা' শুধু সেই জানে। অপরের পক্ষে তা' অনুমান করাও কঠিন।

হয়ত' যে ব্যক্তিটীর জন্য তা'র মনের এই করুণ ক্রন্দন, যা'র জন্য রাত্রি-দিন অবিরল সে অশ্রু বর্ষণ করছে সে ব্যক্তি বিশ্বের অনাদৃত। তা'র জন্য কেহই চিন্তা করে না—তা'র চিন্তা করাও হয়ত' লোকে পাপ মনে করে। কিন্তু তবু সে যে তা'কেই চায়—তা'রই ধ্যানে মগ্ন হ'য়ে থাকতে চায়। হোক্ সে মন্দ, হোক্ সে ঘৃণিত, তবু সে তা'র স্বামী—তা'র নারী জীবনের উপাস্য দেবতা—তা'র লজ্জা, তা'র গৌরব, দুঃখময়

জীবনের একমাত্র শান্তি! তা'কে না হ'লে সে বাঁচবে কেমন কোরে? তা'র অদর্শন যে ক্রমেই অসহ্য হ'য়ে উঠছে। অথচ তা'র সন্ধানই বা কোথায় পাওয়া যায়? সে যে কোথা আছে তা' একমাত্র ভগবানই জানেন।...

বন্দনা ভাবে, স্বামী থাকতেও যে নারী স্বামীর পরিত্যক্তা।—তা'র মৃত্যুই শ্রেয়। তবে মৃত্যুর শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করলেই মৃত্যু আসে না। বন্দনারও তাই এলো না।

দুঃখের দিন বড়ই অসহ্য—কাটতে চায় না! বন্দনার দিন আর কাটে না। তা'র ব্যথিত চিত্ত সর্ব্বদাই সেই দুষ্টমতি স্বামীর অমঙ্গল অশঙ্কায় ভীত। নিয়ত দেবতার পায়ে স্বামীর শুভ কামনায় তা'র প্রাণ আকুল-ব্যাকুল ভাবে আছড়ে পড়ে।—

সে বুদ্ধিমতী; তাই এততেও তা'র মনের গোপন বেদনা অন্য কেউ বুঝতে পারে না। সকলের সাথেই সে হাসে কথা কয়, সকল কর্ম্মেই একটা উৎসাহ প্রকাশমান। বিলাসের চিন্তায় সে যেন মোটেই চিন্তিত নয়, এমনি ভাব সে বাইরে প্রকাশ করে।

কিন্তু তা'র মনের দুর্ব্বলতা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও, অলক ধ'রে ফেলেছিল। অলককে সে ফাঁকি দিতে পারেনি। তা'র প্রতিটি ভাব ভঙ্গীতে নিরন্তর যে বেদনার ধারা বিচ্ছুরিত হয় অলক নিজ অন্তর দিয়েই তা' অনুভব করে। তা'র লাবণ্যহীন বিষাদ পাণ্ডুর মুখখানি দেখে অলকের অশ্রু দমন করা কঠিন হ'য়ে পড়ে।

অলক ভাবে, তবে কি সে অন্যায় কোরেছে—বিলাসের স্বেচ্ছাচারীতার প্রতিবাদ কোরে—বন্দনাকে আটকে রেখে? না ভুল ত' সে করেনি

বিলাসের ব্যবহারে বা তা'র এই দীর্ঘ নীরবতায় এটা সে বেশ বুঝেছে যে, বিলাস আর বন্দনাকে চায় না। এ কথাটা বন্দনারও বুঝতে বাকী নেই। তবে তা'র ভুল কোথায়? বন্দনার অদৃষ্ট মন্দ, সেজন্য সে কি করতে পারে! যতদূর করা সম্ভব সে ত' বন্দনার জন্য কোরেছে।—

সহসা তা'র অন্তর বাসী মানুষটি মাথা নেড়ে বোলে ওঠে,—"না, না বন্দনার জন্যে তুমি কিছুই করনি। যা' কিছু কোরেছ সে সুধু তোমার স্বার্থের জন্যেই। বন্দনাকে তুমি ভালবাস', সে কাছে থাকলে তুমি আনন্দ পাও; তাই তা'কে কাছে পেয়েই তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছ। তা'র মনের দিকে একবার চাইবারও তোমার অবসর নেই। কিন্তু এই কি ভালবাসা! তা'র সুখের জন্যে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দেওয়াই কি তোমার উচিৎ নয়? বিলাসের সন্ধান কোরে, উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা তা'র মন্দ স্বভাবের আমূল সংস্কার কোরে বন্দনাকে তা'র হাতে তুলে দেওয়াই কি তোমার উচিৎ ছিল না?"

—"কিন্তু বিলাসকে পাবই বা কোথায়? আর তা'র মত দুষ্ট প্রকৃতির লোককে কি সৎপথে আনা সম্ভব?"

—"কেন নয়?—বিলাস যদি আজো পৃথিবীর বুকে থাকে তবে তা'কে সন্ধান কোরে কেন না পাওয়া যাবে? আর তোমার শিক্ষার যদি কোথাও না খাদ থাকে তাহ'লে কেনই বা তা'কে সৎপথে আন্‌তে পারবে না?"

সত্যই ত' !...অলক চম্‌কে ওঠে। বন্দনাকে সে যদি সুখী করতে নাই পারে, তবে তা'র ভালবাসার মূল্য কি! বন্দনাকে যদি বাঁচাতে হয়, বন্দনাকে যদি সুখী করতে হয় তাহ'লে সর্ব্ব প্রথমে বিলাসের সন্ধান করা

প্রয়োজন। বিলাসকে না হ'লে—দিন দিন বন্দনার শরীরের যা' অবস্থা হ'চ্ছে—তা'কে বাঁচান যাবে না।...অলক মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, যেমন কোরেই হোক্ বিলাসকে সে খুঁজে বার করবেই, এবং বন্দনার কাছে তা'কে এনে দেবেই। সুধু তাই নয়, এমন ব্যবস্থাও সে করবে যাতে কোরে ভবিষ্যতে আর যেন বন্দনাকে স্বামীর নির্য্যাতন ভোগ করতে না হয়—তাদের যেন স্বামী-স্ত্রীর প্রেমে আর কখনো ভাঁটা না পড়ে। বন্দনার সুখের জন্য সে নিজের জীবন পর্য্যন্ত আহুতি দিতে প্রস্তুত।—

এম্‌নি কোরে দুইটি প্রাণের অনন্ত বেদনার স্রোত নিরন্তর ব'য়ে যায়।

চিন্তায় চিন্তায় বন্দনার শরীর ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে আরম্ভ হ'য়েছে। কেউই এর কারণ খুঁজে পায় না, সকলেই বন্দনার জন্য চিন্তিত। বন্দনাকে তা'র শরীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে সে কেবল ম্লান একটু হাসে। অলককেও জিজ্ঞাসা কোরে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

সেদিন সুরেশ্বরী অলককে জিজ্ঞাসা করলে,—"আচ্ছা অলক! বন্দনার কি হ'য়েছে বলো ত'? দিন দিন যেন ও শুকিয়ে যাচ্ছে! অমন মুখে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে! হাসে, কথা কয় সবই করে, কিন্তু তা'র ভেতর যেন প্রান কোথাও নেই। কেন বল্‌তে পারো?"

অলক তা'র পানে তাকিয়ে বল্লে,—"কেন তা' কি তোমাকেও বোঝাতে হবে দিদি? তুমি কি বোঝ না ওর কত ব্যথা! থেকে না থাকার দুঃখ যে কত প্রবল তা কি তুমিও বুঝতে পার না দিদি! একেবারে না থাকার দুঃখ সইতে পারা যায় কিন্তু আছে অথচ পাবার উপায় নেই এ দুঃখ সওয়া কি যায়?"

সুরেশ্বরী একটুক্ষণ চুপ কোরে থেকে বল্লে,—"কিন্তু পেলেই যেখানে বেদনা সেখানে পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াই ত' বাঞ্ছনীয় অলক!"—

অলক বল্লে,—"কথাটা ঠিক তোমার উপযুক্ত হ'ল না ত' দিদি: অন্তরের সুখ শান্তি যে পাওয়ার মধ্যে সে, পাওয়ায় বাইরের সকল প্রকার বেদনাই যে সহনীয়। নারী হ'য়ে নারীর অন্তরের এ খবরটুকু রাখা তোমার উচিৎ ছিল।...বন্দনার স্বামী আছে, স্বামীকে সে অন্যান্য নারীর মতই ভক্তি করে, ভালবাসে; স্বামীর ভালো মন্দ সংবাদ জানবার জন্যে সে ব্যগ্র। অথচ তা'র উপায় নেই, সে বিতাড়িতা—স্বামী তা'কে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ প্রায় দেড় বছর হ'য়ে গেল সে তা'র স্বামীর কোন খবর পায়নি। তা'র দেহ অমন শুকিয়ে যাবে না ত' কার যাবে দিদি? তুমি হয়ত' বলবে, স্বামী ওর লম্পট বদমাইস, সে ওকে চায় না—ওর প্রতি তা'র টান নেই। তা' হয়ত' সত্যি, কিন্তু সেই লম্পট স্বামীর উপরেই ওর যে ভালবাসা তার ত' তুলনা নেই! কারণ ও যে নারী—বাংলার গৃহলক্ষ্মী! স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করতে এরা জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শেখে। স্বামী যত মন্দই হোক তবু স্বামীই এদের দেবতা—হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ কুসুমাঞ্জলি স্বামীর পায়ে দিয়েই এরা আনন্দ পায়।—আরো একটা কথা বোলে রাখি দিদি, আমাদের ঘরের মেয়েদের এই যে স্বামীর প্রতি প্রেমানুরাগ এর মূল্যও অল্প নয়. এরই জোরে আজো আমরা টেঁকে আছি। নইলে কালের হাওয়া আমাদের কোথায় এতদিন ভাসিয়ে নিয়ে যেত। বন্দনারও প্রেম নিরর্থক হবে না—একদিন ওরই প্রেমের আকর্ষণে বিলাস এসে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে। মানুষের বুকের মধ্যেই

ভগবানের বাস, মানুষকে দুঃখ দিলে সে বেদনা তাঁ'রই বুকে বাজে; এবং যার ফলে—"

অলক হঠাৎ থেমে গেল।...একি, উচ্ছ্বাসের টানে এ সে কোথায় এসে পড়েছে? এযে তা'র নিজেরই কথা!

সুরেশ্বরী তা'র এই সহসা নীরব হওয়ার অর্থ বুঝে তা'র পানে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

আজ দুইদিন হ'ল মাতৃ-সেবাশ্রমের হাসপাতালে কয়েকটি নূতন রোগী এসে আশ্রয় নিয়েছে। অবশ্য তা'রা নিজেরা আসতে সমর্থ হয়নি, তাদের রুগ্ন অচৈতন্য দেহ গুলিকে রাস্তা হ'তে তুলে আনা হ'য়েছে। পূর্ব্ব বঙ্গের কয়েকটি গ্রাম বন্যায় ভেসে যাওয়ায় সে অঞ্চলে ভীষণ রূপে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। যার জন্য গৃহহারা দুঃস্থ বহু নর-নারী দুর্ভিক্ষের উৎপীড়ন হ'তে বাঁচবার আশায় পুত্র কন্যার হাত ধ'রে সেস্থান ত্যাগ কোরেসুভিক্ষর স্থান এই মহা নগরী কলিকাতায় এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু অদৃষ্ট যাদের প্লাবন-প্লাবিত অন্ন তাদের মিলবে কোথায়? এখানে এসেও তাই খাদ্যের অপ্রাচুর্য্যতা হেতু তাদের অনাহার ক্লিষ্ট ক্লিশিত শরীর নানা ব্যাধি আক্রান্ত হ'য়ে পথে পথে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। নাগরিকদের মধ্যে কেউ বা পথে চল্‌তে চল্‌তে অনুকম্পা ভরে একবার তাদের শুষ্ক দেহের পানে তাকালেন, কেউ বা নাসিকা কুঞ্চিত কোরে "পাপের শাস্তি" বোলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন।

তাদেরই রোগাক্রান্ত দেহগুলিকে মাতৃ-সেবাশ্রম সাদরে রাস্তা থেকে তুলে এনে শুশ্রূষা আরম্ভ কোরেছেন। তবে স্থানাভাবে অনেক গুলি রোগীকে সরকারী হাসপাতালেও স্থানান্তরিত করা হ'য়েছে।

মাতৃ-সেবাশ্রমের প্রধানা সেবিকাদের মধ্যে এক একটা কর্ম্মভার এক একজনের 'পরে নির্দ্দিষ্ট করা ছিল।—সুরেশ্বরীর 'পরে ছিল ; অতিথি এবং রোগীদের আহার্য্য প্রস্তুতের ভার···বন্দনার 'পরে ছিল, যথা সময়ে রোগীদের পথ্য এবং অতিথিদের আহার্য্য বিতরণের ভার ; মালতীর পরে, সন্ধ্যা সকাল সেবাশ্রমের বিশাল অঙ্গন পরিষ্কার করা থেকে সুরু কোরে রোগীদের বস্ত্র ও নোংরা শয্যাদি ধৌত, তাদের পরিষ্কৃত করা। অর্থাৎ সকল প্রকার অশুদ্ধ ও অপকৃষ্ট কর্ম্ম, যা' করতে সাধারণ লোকের ঘৃণার উদ্রেক হয়, সেগুলি শুদ্ধচিত্তে, দ্বিধাহীন ভাবে তা'কেই করতে হয়। ছায়ার 'পরে সমস্ত কিছুর তত্ত্বাবধানের ভার বিন্যস্ত। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই এরা প্রত্যহ যে যা'র করণীয় কর্ম্মগুলি কোরে যায়। অলক তাই দেখে আর তৃপ্তিতে প্রাণখানা তা'র ভ'রে ওঠে।

আজ সকাল হ'তেই একটা বিশেষ প্রয়োজনে অলক বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছিল, এমন সময় ছায়া এসে ডাকলে,—"অলকদা' !"

—"কিরে ?"···পিছন ফিরে তাকাতেই অলক দেখলে তা'র পশ্চাতে ছায়া দাঁড়িয়ে।

সে জিজ্ঞাসা করলে,—"কিরে ছায়া, খবর কি ?"

ঠোঁট উল্‌টে, ভ্রূ কুঁচকে ছায়া বল্লে,—"খবর আর কি ; তোমার ঐ বৌদিটীর কথাই বল্‌ছিলুম।"

—"কি কথা রে ?"

—"ওর বাপু ঘেন্না পিত্তি বোলে কোন জিনিষ নেই !"

অলক হো হো কোরে হেসে উঠে বল্লে,—"কেন রে, হ'ল কি ?"

—"হবে আর কি ! ও ঐ নিবিন্নের মত নোংরা ঘেঁটে ঘেঁটে শেষে

একটা ব্যায়রাম বাঁধিয়ে বসবেই বসবে, এই আমি বোলে দিলুম। তোমাকে এত কোরে বলি যে, হাসপাতালের জন্যে গোটা দুই অন্তত মেথর বন্দবস্ত করতে, তা ত' তুমি করবে না কিছুতে। কাল রাত থেকে সাত নম্বর ঘরের সেই ছেলেটার ভেদ-বমী হ'চ্ছে আর তা'র সেই সব নোংরা কাপড়-চোপড় গুলো ও দিব্যি হাসি মুখে কাচ্‌চে কুচ্‌চে—একটু ঘেন্না নেই গা! আবার বলূলে বলে কি না 'এতে আর ঘেন্নার কি আছে?' আমরা ত' সে পচা গন্ধে তিষ্ঠতে পারলুম না। ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই!"...একটা বিশ্রী মুখ ভঙ্গী কোরে ছায়া বল্লে,—"বাপ রে, বাপ রে, বাপ—সে গন্ধ মনে পড়লে এখনো আমার গা' গুলিয়ে ওঠছে!"

আনন্দে লাফিয়ে উঠে অলক বল্লে,—"সত্যি বল্‌ছিস্ ছায়া, বৌদির একটুও ঘেন্না কচ্ছে না?"

—"ওর কি ঘেন্না আছে ছাই যে করবে? কিন্তু তুমি ত' দেখ্‌ছি শুনে একেবারে আমোদে লাফাতে অরম্ভ কোরে দিলে গো অলকদা'?"

—"লাফাব না? আজ আমার আনন্দ কত হল তা' তুই বুঝবি কি দিদি!"

—"এ আনন্দের হেতু?"

—"হেতু? হেতু এইটুকু জেনে যে, আজ বৌদি'র মনের গ্লানি সত্যি সত্যিই দূর হ'য়েছে!"

একটু চুপ কোরে থেকে ছায়া বল্লে,—"তা হ'য়েছে হোক্, কিন্তু তাই বোলে ওকে দিয়ে অমন মেথরের কাজগুলো করিয়ে নেওয়া তোমার উচিৎ নয় অলকদা'!"

হাসতে হাসতে অলক বল্লে,—"সে কি-রে? ওকে শোধরাবার ঐটেই ত' একমাত্র পথ। বাইরের নোংরা পরিষ্কার করতে করতে তবে ত' ওর অন্তরের নোংরা পরিষ্কার হবে রে পাগ্‌লী।"...একটু থেমে সে আবার বল্লে,—"আজ আমার সত্যিই খুব আনন্দের দিন রে ছায়া! আরো আনন্দ আজ আমার এইটুকু জেনে যে, আমার অভাবে মাতৃ-সেবাশ্রমের কাজ তোরা চালিয়ে নিতে পারবি।"

—"মানে?"

—"মানে, অদৃষ্টের কথা ত' কিছু বলা যায় না বোন"—

—"আচ্ছা, আচ্ছা খুব হ'য়েছে—আর বুড়োমো করতে হবে না।"

"—বুড়োমো করলেও কিছু অন্যায় করা হবে না রে দিদি—বয়সও ত' প্রায় পঞ্চাশের কাছে এসে পড়লো।"

—"ফের"—

সবেগে ছায়া মুখখানাকে বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে নিল।

সস্নেহে তা'র পৃষ্ঠে মৃদু মৃদু আঘাত করতে করতে অলক বল্লে, "রাগ করিস্ নে দিদি, অন্যায় আমি কিছুই বলিনি।"

—"না বলোনি।"...

ছায়ার চক্ষুদুটি তখন অশ্রু পূর্ণ।

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কাটার পর অলকই প্রথম কথা কইলে; বল্লে,—"আচ্ছা, আমি একটু ঘুরে আসি ছায়া।"

ছায়া তা'র পানে তা'কিয়ে প্রশ্ন করলে,—"কোথায় যাওয়া হ'চ্ছে শুনি?"

—"একটু দরকারে।"

—"তা' ভালো, কিন্তু এদিকে যে তোমার মা'টি লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে মরচেন! তাই আমরা ভেবে পাই না যে, ওর দেহ অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন? তা' অত ভাবলে কাঁদলে কি আর শরীর থাকে!...কাল রাত্তিরে ও আমার কাছে শুয়েছিল। হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে আমার ঘুম্‌টা ভেঙে গেল। শুনতে পেলুম, যেন কে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বিড় বিড় কোরে বকছে। বেশ ভালো কোরে শুনতেই বুঝলুম—বন্দনা। ওদিকের বারাণ্ডার আলোটা ঘরে এসে পড়েছিল; তাইতে দেখলুম, ও বুকের ওপর একটা কি চেপে ধ'রে হাউ হাউ কোরে কাঁদছে, আর কত কি বিড় বিড় কোরে বক্‌ছে। তারপর আমার সাড়া পেতেই লক্ষ্মী মেয়েটির মত ঝুপ কোরে ও বিছানায় শুয়ে পড়লো। আজ সকালে উঠে দেখি ওর বিছানায় এইটে পড়ে আছে। হয়ত' ভুলে ফেলে রেখে উঠে গেছে!"

...বস্ত্র মধ্য হ'তে একটি ছবি বার কোরে সে অলককে দেখালে।

অলক দেখলে ছবিটি বিলাসের। তা'র দুই চক্ষু বেয়ে দর দর ধারে অশ্রু নেমে এলো। ছায়ারও চক্ষু শুষ্ক রইল না।

উভয়ে বহুক্ষণ স্থির দৃষ্টে ছবিখানির দিকে চেয়ে রইল। পরে এক সময়ে ছায়া বল্লে,—"লক্ষ্মীছাড়া স্বামীটার কথা ভেবে ভেবে শেষে মেয়েটা না পাগল হয়! কি কুক্ষনেই হতভাগা ছোঁড়া মেয়েটার মাথা খেতে ওর চোখের সামনে এসেছিল!"—

অলকের বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস আছাড় খেয়ে পড়লো।...

শ্রাবণের দুর্যোগময়ী গভীর রাত্রি। নগরীর অশ্রান্ত কলরব বহু পূর্ব্বেই নীরব হ'য়ে গেছে। কচিৎ দু'এক খানা যান-বাহনের চলা-চলের শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রুত হয় না।

সকাল হ'তে সেই যে বৃষ্টি নেমেছে তা'র আর বিরাম নেই, বর্ষণে বর্ষণে সে যেন ধরণীকে আজ ভাসিয়ে দিতে চায়। তার উপর সন্ধ্যা থেকে সুরু হ'য়েছে প্রবল ঝড়। ক্ষিপ্তা মাতঙ্গিনীবৎ প্রকৃতি দেবী আজ ধরণীর বুকে সুরু কোরেছেন প্রলয় নর্ত্তন। রাজপথের আলোকগুলি প্রকৃতির সে দৃষ্টি কটু বীভৎসতায় একে একে বহুক্ষণ নয়ন মুদ্রিত কোরে ফেলেছে। গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে ঢেকে গেছে।

কলিকাতার পরিষ্কার বাঁধান রাস্তাগুলি আজ হ'য়ে উঠেছে অত্যন্ত দুর্গম। নিবিড় অন্ধকারের বুকে চমক জাগিয়ে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠছে দামিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। মাঝে মাঝে গর্জ্জে উঠছে অশনি।...

এ হেন দুর্য্যোগকালে যখন আশঙ্কিত নগরবাসী অপনাপন রুদ্ধ গৃহের মধ্যে থেকেও নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না, একটি প্রাণী তখন সকল বিপদ, সকল ভয় উপেক্ষা কোরে দুর্নিরীক্ষ অন্ধকার সেই পথ বেয়ে চলেছিল। বলা বাহুল্য সে ব্যক্তি অলক। বাইরের ঝঞ্ঝা অপেক্ষা ভিতরের ঝঞ্ঝাই হয়ত' তা'র বেশী; তাই এমন দিনেও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিলাসের সন্ধানে। বিলাস না হ'লে বন্দনার জীবন রক্ষা অসম্ভব।

ইতিমধ্যে বিলাসের গমনাগমনের উপযোগী প্রায় সকল স্থানই সে অন্বেষণ কোরেছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই হ'য়েছে নিরাশ—তা'কে কোথাও পাওয়া যায়নি।

আজো সে তা'রই সন্ধানে বেরিয়েছে। সারাদিন এবং এতটা রাত্রি পর্য্যন্ত সহরের নানা স্থানে তা'র সন্ধান কোরে বিফল চিত্তে এখন সে সেবাশ্রমের পানে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ফিরে চ'লেছে। সারা দেহ তা'র বৃষ্টির জলে সিক্ত, অঙ্গ এবং পরিধেয় হ'তে টপ টপ কোরে জল ঝ'রে পড়ছে।

তার আবার প্রচণ্ড হাওয়ায় সর্ব্ব শরীর তাঁ'র কেঁপে কেঁপে উঠছে। মনে হ'চ্ছে যেন হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত বাতাসের সেই অসহ্য শীতলতা সে অনুভব করছে। তথাপি তা'র চলার বিরাম নেই—দিনের অধিকাংশ সময় ও এতটা রাত্রি পর্য্যন্ত আজ তা'র এই ভাবেই পথে পথে কাটছে।

গৃহে সে মুহূর্ত্তকাল থাকতে পারে না। বন্দনার মুখের দিকে তাকালে তা'র বুক যেন ফেটে যায়। সে যেন বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি! তা'র সজল চোখের অব্যক্ত বেদনার ভাষা সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। গৃহে থেকে সেই বেদনা দায়ক অসহ্য মর্ম্মপীড়া সহ্য করা অপেক্ষা বাইরের এ কষ্ট তা'র কাছে সহনীয়। তাই সে গৃহের চেয়ে বাইরেই থাকে ভালো।......

রাত্রির গভীরতা যত বাড়ছে ঝড় জলের প্রচণ্ডতাও ততই বেড়ে চলেছে। রাস্তায় স্থানে স্থানে এত অধিক পরিমাণ জল দাঁড়িয়ে গেছে যে, পথ চলা একরূপ অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। অতিকষ্টে সেই দুর্গম পথ অতিক্রম কোরে চিন্তিত মনে অলক গৃহাভিমুখে চলেছিল।

আজো তা'র সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে গেল,—বিলাসকে সে কোথাও পেলো না।...তবে কি বন্দনার শুষ্ক মুখে সে হাসি ফোটাতে পারবে না! তা'র সকল শ্রম, সকল চেষ্টা কি তবে নৈরাশ্যে পর্য্যবসিত হবে!—সে তা'র প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারবে না!—

এমন সময় বড় রাস্তা ছেড়ে সে একটা ছোট গলির মধ্যে প্রবেশ করলে। গলিটা তা'র বিশেষ পরিচিত না থাকায় এবং স্থানটা অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় প্রবেশ মুখেই একটা কিসে ঠোক্কর লেগে সে প'ড়ে গেল।..."উঃ!"...আঘাতটা বেশ জোরেই লেগেছিল, যে জন্য দু'বার

চেষ্টা কোরেও সে সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়াতে পারলে না। স্থানটাতে আবার এত জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, তা'র মনে হ'তে লাগলো যেন সে একটা পুকুরের মধ্যেই প'ড়ে গেছে।

যাই হোক্! অল্পক্ষণ মধ্যেই সে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।--

চিন্তায় মানুষ অনেক সময় অনেক কিছুই বিস্মৃত হয়।—প্রয়োজনীয় দ্রব্যটী হাতের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তারি সন্ধানে ছুটো ছুটি করতেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। এমন স্মৃতি-বিভ্রাট প্রায়ই লক্ষ্যিত হয়।—

অলকের কতকটা সেইরূপই হ'য়েছিল। অবশ্য তা'কে ছুটোছুটি করতে না হ'লেও এতক্ষণ সে সম্পূর্ণ ভুলেই গিয়েছিল যে, তা'র পকেটে একটা টর্চ আছে। এই সময় হঠাৎ নিজেরই হাতের ধাক্কায় সেটা জ্বলে ওঠতো তা'র মনে পড়লো সেটার কথা। আপন মনে একটু হেসে সে বল্লে,—"আচ্ছা পাগল ত' আমি! অন্ধকারে এতক্ষণ হাঁটছি অথচ এটার কথা একেবারে মনেই নেই!" পকেট হ'তে টর্চটা বার কোরে জ্বাল্‌তেই স্থানটা আলোকিত হ'য়ে গেল। সে' আলোয় পথটা ভালো কোরে দেখে নিয়ে সে পুনরায় পথ চলা সুরু কোরে দিলে। দূরে একটা বজ্র নির্ঘোষের শব্দ শোনা গেল,—কড়—কড়—কড়াৎ! এক ঝলক বিদ্যুতের আলো তা'র চক্ষুদুটো ঝল্‌সে দিয়ে গেল। একবার থেমে সে আবার চল্‌তে লাগলো।

সে গলিটা পার হ'য়ে তদপেক্ষা আরো একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে সে প্রবেশ করলো। গলিটার দুই দিকে সবই প্রায় খোলার ঘর। সম্ভবতঃ সেটা কোন বস্তি। মধ্যকার স্থানটুকু অত্যন্ত পিচ্ছিল এবং কর্দ্দমাক্ত।

সতর্কতার সঙ্গেই সে চলেছিল। বৃষ্টিটাও এই সময় বেশ জোরে পড়তে আরম্ভ কোরেছিল।

সহসা অতি নিকটের এক গৃহ হতে একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বর তা'র কানে এসে বাজলো,—"বাবা গো—!" একটা পতনের শব্দও সে শুনতে পেলো। ঠিক পর মুহূর্ত্তেই একটা ধ্বনি উঠলো—"খুন, খুন—পালালো"—সঙ্গে সঙ্গে অদূরে কার দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল। ধ্বনিটা তা'র দিকেই এগিয়ে আসছে বোলে মনে হ'ল। হাতের টর্চটা নিভিয়েই সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কারণ আলো দেখলে যদি লোকটা অন্য দিকে পালায়! লোকটাকে ধরবার জন্য সে প্রস্তুত হ'তে লাগলো। কি ভেবে সে একটু পাশে স'রে দাঁড়াতে যাবে, ঠিক সেই সময় একেবারে হুড় মুড় কোরে কে তা'র ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো। ধাক্কাটা খুব প্রচণ্ড ভাবে লাগা সত্বেও সে তা'কে সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বাহুপাশে বেঁধে ফেললো। টর্চের আলোটা সেই ধৃত ব্যক্তির মুখের 'পরে ফেলতেই কিন্তু তা'র সর্ব্বশরীর হিম হ'য়ে এলো, শিরায় শিরায় একটা প্রবল শিহরণ ব'য়ে গেল, চক্ষুর সম্মুখে সারা পৃথিবী ঘুরতে লাগলো। সে দেখলে,—রক্তাক্ত কলেবরে বিলাস তা'র বাহুপাশে আবদ্ধ! অজ্ঞাতে তা'র বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠ হ'তে উচ্চারিত হ'ল,—"বিলাস—!"

—"না, না আমি—আমি—আমি নই"—

ভীতি জড়িত কণ্ঠে উত্তর নিঃসৃত হ'ল।"…

ক্ষণমধ্যে অলক নিজেকে সামলে নিয়ে বোলে উঠলো,—

"বিলাস কি করলে তুমি?—কাকে খুন করলে? এত খোঁজার পর যদি বা ভগবানের দয়ায় তোমায় পেলুম, ত' এই অবস্থায় কেন পেলুম!"

…তা'র যেন জোরে চীৎকার কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হ'ল। বিলাসের দেহটাকে সজোরে নাড়া দিয়ে সে আবার বল্লে,—"কাকে খুন করলে?"

—"খু-উ-উন্ করিনি আমি।"…বিলাস কেঁদে ফেল্লে।

অলক ধমক দিয়ে উঠলো,—"ফের মিথ্যে কথা; সত্যি কোরে বলো কাকে খুন কোরেছ? তোমার কোন ভয় নেই—আমার কাছে সত্যি কথা বলো।"

…অন্য সময় হ'লে বিলাসকে সে আপনি বোলেই সম্বোধন করত; এখন সে সম্মান প্রদর্শনের কথা তা'র মনেই এলো না।—

বার কয়েক ঢোক্ গিলে, শুষ্ক জিহ্বাটা ওষ্ঠে লেপন কোরে, কণ্ঠ এবং ওষ্ঠদ্বয়কে সিক্ত করবার ব্যর্থ চেষ্টা কোরে বিলাস বল্লে,—

—"ঐ হিমী— হিমীকে ছুরি মেরেছি; বোধ হয়—বোধ হয় এতক্ষণ মরে গেছে!"…

সহসা সে অলকের পা'দুটো জড়িয়ে ধরে বোলে উঠলো,—"আমাকে বাঁচান! ওরা আমাকে ধরতে আসবে! আমাকে বাঁচান—আমাকে ছেড়ে দিন—!"…এমন সময় পশ্চাতে কতকগুলি পদশব্দ শ্রুত হ'ল। বিলাস ব্যাকুল ভাবে বোলে উঠলো,—"ঐ ওরা আসছে! আমায় ছেড়ে দিন—দয়া কোরে আমায় ছেড়ে দিন!"

অলক বল্লে,—"ছেড়ে দিলেই কি পুলিশ তোমাকে রেহাই দেবে?"

—"তবে, তবে কি হবে?…আপনি আমাকে বাঁচান—আপনার পায়ের চাকর হ'য়ে থাকবো"—

অলকের মুখে একটু ম্লান হাসি দেখা গেল। সে বল্লে,—"তুমি আমাকে চিনতে পার?"

—"না।"

—"এই দেখ।"...টর্চের আলোটা সে নিজের মুখে একবার ফেল্‌লো।

—"অলক বাবু! আপনি অলক বাবু—য়্যাঁ—!"

—"হুঁ"—

অত্যন্ত বিপদে মানুষ যখন আত্মহারা হ'য়ে পড়ে তখন যে কোন অবলম্বন সামনে পেলেই সে আঁকড়ে ধরতে যায়। তখন সে ভাবতেও পারে না যে, সেই অবলম্বনের ক্ষমতা কতটুকু। বিলাসেরও সেই অবস্থা।—অত্যধিক মদ্যপান হেতু মস্তিষ্কের অস্থিরতায় কিছু পূর্ব্বে সহসাই যে কাণ্ড সে কোরে ফেলেছে, এখন সেই কৃত কর্ম্মের শাস্তি কল্পনা কোরে সে বিশ্ব সংসার অন্ধকার দেখতে লাগলো।

...ব্যাপারটা ঘটেছিল এই:—বিলাস অনেক দিন ধ'রে হিমী ওরফে হেমাঙ্গিনী নাম্নী এক বেশ্যার গৃহে যাওয়া আসা করত'। বিলাসের ইচ্ছা ছিল না অন্য কোন পুরুষ হিমীর গৃহে প্রবেশ করে; যার জন্য সে তা'কে বহুবার বারণও কোরেছে। কিন্তু হিমী তা'র সে কথায় কোনদিন কর্ণপাত করেনি। উপরন্তু প্রত্যহই বিলাস দেখত' হিমীর ঘরে নূতন নূতন লোক। এদানি সে তা'কে শাসন করতেও ছাড়ত না। তাতেও যখন সে দেখলে কোন ফল হ'ল না, তখন সে ক্ষেপে গেল। প্রতিশোধ নেবার জন্য সে সুযোগ খুঁজতে লাগলো। তার উপর গত রাত্রে ঐ বিষয় নিয়ে হিমীর সঙ্গে তা'র খুব বচসা হয়, এবং রাগে সে হিমীকে ঘা' কতক প্রহারও করে। তজ্জন্য হিমীও পড়সীদের সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে তা'কে বহিষ্কৃত কোরে দেয়। অপমানিত হ'য়ে তা'র প্রতিহিংসা বাসনা আরো বেড়ে ওঠে।

আজ গভীর রাত্রে যখন সে একখানা শানিত ছুরিকা হস্তে হিমীর

গৃহে প্রবেশ করে, আশ পাশের গৃহস্থরা তখন নিদ্রামগ্ন, বাইরেও ভীষণ ঝড় জল। হিমী একাকীই কক্ষমধ্যে ছিল, এবং কক্ষের দ্বার মুক্ত না থাকলেও অর্গল বদ্ধ ছিল না। কাজেই প্রবেশে বিলাসের কোন বাধা উপস্থিত হয়নি।

হিমী তখনও নিদ্রা যায়নি। দ্বারের দিকে পশ্চাৎ কোরে কি একটা কর্ম্মে সে ব্যস্ত ছিল। সহসা একটা প্রবল আকর্ষণে সচকিত হ'য়ে পিছন ফিরে তাকাতেই সে বিলাসকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেলে। বিলাসের হস্তের চক্‌-চকে ছুরিটার প্রতি তা'র দৃষ্টি পড়তেই ভয়ে, আতঙ্কে সে চীৎকার কোরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের হাতের ছুরিকাখানাও তা'র বক্ষে আমূল বিদ্ধ হ'য়ে ব'সে গেল।···"বাবা গো"—হিমীর অচৈতন্য দেহখানা তৎক্ষণাৎ সেইখানে লুটিয়ে পড়লো। কক্ষ মধ্যে রক্তের স্রোত ব'য়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বাইরে উপর্য্যুপরি দু'টো বজ্র গর্জ্জে উঠলো। সে গর্জ্জনে বিলাসের বক্ষস্থল কেঁপে উঠলো। হিমীর মৃতপ্রায় রক্ত ঝরা দেহটার পানে তাকিয়ে সে কেমন হ'য়ে গেল। তা'র নেশা তখন কোথায় অন্তর্হিত হ'য়েছে।···এ সে কি করলে! ভয়ে তা'র সর্ব্ব শরীর ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপতে লাগলো। সে কি করবে ভেবে পেলো না। চিন্তাও তা'কে তখন পরিত্যাগ কোরেছে।

বাইরে কা'র গলার আওয়াজ শুনতে পেতেই সে উন্মত্তের মত পথে বার হ'য়ে এলো, এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু তাতেও সে নিস্তার পেলে না, পথি মধ্যেই অনেকের হস্তে সে বন্দী হ'ল। আচম্বিতে বাধা পেয়ে সে যেন কেমন নিশ্চেষ্ট হ'য়ে পড়লো। নিজেকে তা'র সম্পূর্ণ অসহায় বোলে মনে হ'ল। সে যে কি করবে, কি

ব'লবে কিছুই যেন ঠিক করতে পারলে না। উদ্ধার যে আর কোন মতেই সে পাবে না, তা' বুঝতে তা'র আটকাল না। যে লোকের হাতে সে বন্দী হ'য়েছে, সে লোক যে তা'কে এক্ষুনি পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবে এটা বুঝতে তা'র দেরী হ'ল না ; তাই সে প্রথমটা কেমন সম্বিৎ হারিয়ে ফেল্লো। তারপর কি ভেবে সে কাতরে মিনতি করতে লাগলো, তা'কে ছেড়ে দেবার জন্য। অবশ্য সম্মুখের লোকটি যে তা'র পরিচিত হ'তে পারে এমন অসম্ভব চিন্তা সে মনেও আনতে পারেনি। কিন্তু সহসা লোকটি নিজেকে চেনা দেওয়ায় সে যেন অকূলে কূল পেলো। প্রথমে নিজের চক্ষুকেই সে বিশ্বাস করতে পারলে না। পরে যখন নিশ্চিৎ রূপে বুঝলে যে, লোকটি অলক তখন সে তা'র পা' দুটো সবলে আঁকড়ে ধ'রে বোলে উঠলো,

—"আমায় বাঁচান—আমায় বাঁচান অলক বাবু !"

...কি জানি কেন তা'র মনে হ'ল যে, অলক ইচ্ছা করলে তা'কে নিশ্চয়ই বাঁচাতে পারে। অলকের পায়ের উপর উপুড় হ'য়ে পড়ে সে কাতর প্রার্থনা জানালে। বিপদে মানুষ এমনই হ'য়ে পড়ে !—

অলকও যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছিল। অকস্মিক সঙ্ঘটনে সেও রীতিমত শঙ্কান্বিত হ'য়ে পড়েছিল। বন্দনার শুষ্ক মুখখানা যেন তা'র চারিপার্শ্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোলে মনে হ'ল। মনে হ'ল তা'র প্রতিজ্ঞার কথা। কিন্তু...

সহসা কি ভেবে সে বিলাসের উদ্দেশে বল্লে,

—"তোমাকে আমি বাঁচাতে পারি কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করো, আমি যা' বলবো করবে ?"

ব্যাকুল ভাবে বিলাস বল্লে,—"করবো, করবো—আপনার পায়ের গোলাম হ'য়ে থাকবো"—

—"ঠিক ?"—

—"ঠিক্"—

—"জীবনে আর এ মন্দ পথে আসবে না ?"

—"না।"

—"মদ খাবে না ?"

—"না।"

—"বন্দনাকে আর কোনদিন কোন রকম কষ্ট দেবে না ?

—"না।"

—"ঠিক্ ব'লছ ?"

—"হ্যাঁ ঠিক —আপনি আমায় বন্দনার কাছে পৌঁছে দিন ! আমি আর কক্ষনো তা'কে কষ্ট দোব না। আমায় রক্ষে করুন—আমি, আমি আর কোনদিন তা'কে মারবো না—কষ্ট দোব না'—সত্যি বলছি।"

—"যদি"কষ্ট দাও তাহ'লে কি হবে ?"

— "তাহ'লে আমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবেন"—

মুহূর্ত্ত মাত্র কি চিন্তা কোরে অলক তা'র বাহুতে একটা আকর্ষণ কোরে বল্লে,—"আচ্ছা, তাহ'লে এসো আমার সঙ্গে।"...তা'র হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে একটা পাশের গলির মধ্যে অলক ঢুকে পড়লো, এবং মাতৃ-সেবাশ্রমের পানে দ্রুত পা' চালিয়ে দিলে।

প্রকৃতির উন্মত্ততাও তখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ইতিমধ্যে ছিমীর

গৃহেও বেশ ভীড় জমে গেছে—আসামীর সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটা-ছুটি আরম্ভ কোরে দিয়েছে।...

অলক যখন বিলাসকে নিয়ে সেবাশ্রমে পৌঁছাল, তখনো রাত্রি অনেক বাকী। প্রত্যহ রাত্রে বাইরে যাবার সময় অলক সেবাশ্রমের পিছন দিকের একটা দরজায় তালা দিয়ে যেত; কারণ তা'র আসার কোন নির্দ্ধারিত সময়ও ছিল না, এবং নিজের জন্য লোককেও সে ব্যস্ত করতে ভালোবাসত না বোলে। তাই সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করতে তা'র কারো সাহায্যের প্রয়োজন হ'ল না—

বিলাসকে একেবারে নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে সে বল্লে,

—"চট্ কোরে কাপড় জামাগুলো বদলে ফেল—ঐ নাও, ঐখানে কাপড় জামা সব আছে। আমি এক্ষুনি আসছি।"

সে একপ্রকার ছুটে ঘর হ'তে বার হ'য়ে গেল।

...অল্পক্ষণ মধ্যেই সে ঘুমন্ত বন্দনাকে জাগিয়ে তুলে টান্‌তে, টান্‌তে সেইস্থানে নিয়ে এলো।

—"এ কি!"...ঘরে প্রবেশ কোরেই বন্দনা চম্‌কে উঠলো। তা'র কণ্ঠতালু পর্য্যন্ত শুকিয়ে উঠলো। কল্পনাতীত রূপে বিলাসকে সেস্থানে দেখে সে হাসবে কি কাঁদবে কিছুই বুঝতে পারলে না। ক্ষণকাল বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত সে হারিয়ে ফেল্‌লো। ফ্যাল ফ্যাল কোরে একবার অলকের পানে একবার বিলাসের পানে সে তাকাতে লাগলো।

ইতিমধ্যে বিলাস কাপড় জামা বদলে, ঘরের এক পাশে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপছিল। তা'র পানে তাকিয়ে অলক ডাকলে,

—"বিলাস! এদিকে এসো।"

যন্ত্রচালিতের মত বিলাস তা'র সামনে এসে দাঁড়ালো। বন্দনার একখানা হাত ও বিলাসের একখানা হাত এক সঙ্গে চেপে ধ'রে অলক গম্ভীর কণ্ঠে বল্লে,—

"বিলাস, ভুলে যেওনা তোমার সে প্রতিজ্ঞা—এই নাও, আমার মা'কে আবার নোতুন কোরে তোমার হাতে সঁপে দিলুম। জীবনে আমার মা'কে আর কষ্ট দিও না। তোমার কাছে আজ আমার জীবনের প্রথম এবং এই শেষ আদেশ ও মিনতি যে, আমার মায়ের অমর্য্যাদা কখনো আর কোরো না। এর পরেও যদি আমার মাকে কষ্ট দাও, তাহ'লে ঐ ওপর দিকে চেয়ে দেখো, বিচারক বসে আছেন—বিচার করবেন!"···বন্দনার পানে তাকিয়ে সে বল্লে,—"আর মা, অনেক অপরাধ হয়ত' তোমার কাছে কোরেছি—ক্ষমা কোরো। আমার আর বেশীক্ষুণ দাঁড়াবার সময় নেই!—যাবার আগে আর একটা কথা, আর একটা অনুরোধ তোমাদের কোরে যাই, সম্ভব হ'লে রাখতে চেষ্টা কোরো, —তোমাদের অনন্ত এবং অক্ষুণ্ণ প্রেমের তলায় আমার অতি সাধের মাতৃ-সেবাশ্রমকে একটু আশ্রয় দিও। আচ্ছা তাহ'লে বিদায়!"

বন্দনা এতক্ষণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গিয়েছিল। কি যে হ'চ্ছে এবং অলক যে কি বলছে, কিছুই যেন তা'র বোধগম্য হ'চ্ছিল না। এবার অলকের শেষের কথাটায় তা'র চমক্ ভাঙ্গলো। কি একটা অচিন্তনীয় সম্ভাবনা অনুমান কোরে সে অলককে প্রশ্ন করলে,

—"বিদায়! মানে? কোথায় যাবে তুমি—এই ঝড় জলের মধ্যে?"

অলক একটু কেমন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। বন্দনার প্রশ্নে সচকিত হ'য়ে কি একটা সে বলতে যাবে এমন সময় বিকট রবে একটা

বজ্র পতনের শব্দ হ'ল। সে ভয়ঙ্কর শব্দে তিনজনেরই বুক কেঁপে উঠলো। তৎক্ষণাৎ কম্পিত কণ্ঠে বন্দনা পুনরায় প্রশ্ন করলে,

—"কোথা যাবে তুমি অলক—এই দুর্যোগে ?"—

সহসা বজ্রের মতই উচ্চ শব্দে উন্মত্তবৎ অলক অট্টহাস্য কোরে উঠলো। হাসির বেগ একটু প্রশমিত হ'লে অলক বল্লে,

—"দুর্যোগ ! জীবনটা যা'র দুর্য্যোগে ঘেরা—অন্তর যা'র ঝঞ্ঝাবাতে' আক্রান্ত, বাইরের প্রভঞ্জনে তা'র কি ভয় করা সাজে মা ?"...

'কথা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই সে একবার স্তম্ভিত বন্দনা এবং বিলাসের পানে তাকিয়ে উল্কা গতিতে ঘরের বার হ'য়ে গেল।—

তারপর বাইরের প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল, ...আর দেখা গেল না।

* * *

...তারি পরদিন একখানা সংবাদ পত্রের একটি বিশেষ সংবাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বন্দনা স্থাণুর মত বসেছিল। তা'রই পার্শ্বে ব'সে সুরেশ্বরী, ছায়া এবং মালতীও সেই দিকে চেয়ে বজ্রাহতের মতই নিশ্চল হ'য়ে গিয়েছিল। অদূরে আরো এক ব্যক্তি অপরাধীর মত জড় সড় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। সে—বিলাস।

সংবাদ পত্রের যে স্থানটি দর্শনে তাদের ঐ প্রকার অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে সে স্থানে বড় বড় অক্ষরে এই সংবাদটি প্রকাশিত হ'য়েছিল,—

"খুনী আসামীর স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ"...

এবং নিম্নে ঘটনার বিবৃতিতে সম্পূর্ণ সংবাদটি এইরূপে বর্ণিত ছিল,—

"গতকাল রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার সময় ঝামাপুকুর অন্তর্গত একটি বস্তির মধ্যে হিমী ওরফে হেমাঙ্গিনী নাম্নী এক বারবনিতা কোন দুর্বৃত্তের হস্তে নিহত হয়। আরো জানা গিয়াছে যে, ছুরিকার সাহায্যেই ঐ হত্যা সাধিত হয়। সংবাদ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পুলিস তথায় উপস্থিত হইয়া নানা স্থানে হত্যাকারীর অনুসন্ধান আরম্ভ করে। কিন্তু তৎকালে আসামীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাত্রি অনুমানিক চার ঘটিকার সময় আসামী নিজে আসিয়া পুলিসের হস্তে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। আসামীর নাম,—অলক কুমার রায়।"—

সংবাদ পত্রের সে স্থানটি তখন বন্দনার অশ্রুজলে সিক্ত হ'য়ে গেছে। সুন্দরী, ছায়া ও মালতীর অশ্রু বিসর্জ্জনের অবস্থাও তখন ছিল না। আকিত ধরণীর সকল দৃশ্য ম্লান হ'য়ে গিয়ে তাদের চোখের সামনে ে উঠলো, সর্ব্বত্যাগী অলকের সৌম ধীর প্রতিমূর্ত্তি। মর্ম্মে মর্ম্মে ের উঠলো অলকের সুধা-ঝরা কণ্ঠের কত শত বাণী—কত সঙ্গীত।

ছায়ার মনে পড়লো অনেকদিন আগেকার একটা কথা। অলক লেছিল,

—"আমিই হব পৃথিবীর এক নব উদাহরণ মায়ের সুখের জন্যে নিজের জীবন দিয়ে—।"

কথাটা চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই ছায়া আর্তনাদ কোরে বোলে উঠ্‌লে.

—"ওগো. সে যা' বোলেছিল, তাই করলে—"

সমাপ্ত